

ত্রিপুরা দেশের কথা

(১৬২৬—১৭১৫ খৃঃ)

TRIPURA DESER KATHA

আসামের বাজা কত্র সিংহ ত্রিপুরা দেশে রত্ন কন্দলী ও অর্জুন দাস নামক দুইজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'ত্রিপুরা দেশের কথা'র পাণ্ডুলিপি তাহাদের দ্বারা ১৬৪৬ শকাব্দে বচিৎ। লণ্ডন সহরে ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত 'ত্রিপুরা দেশের কথা' নামক হস্তলিপিত পুথি হইতে এই পুস্তকের পাঠ সংগৃহীত হইল।

TRIPURA DESER KATHA, written in 1724 A. D. by Ranta Kandali and Arjun Das, Ahom king Swargadeo Rudra Singha's envoys to Raja Ratna Manikya Deb of Tripura.

From an old manuscript named 'Tripura Desar Katha' in the British Museum, London.

EDITED BY

Tripur Chandra Sen B. Com, B. L., Advocate, Convener,
Tripura Regional Records Survey Committee, Agartala, Tripura.

সর্বস্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক :—

ত্রিপুরা চন্দ্র সেন, বি কম, বি এল,
এডভোকেট,
আগরতলা, ত্রিপুরা।

মূল্য :—

ডায়মণ্ড প্রেস, আগরতলা, ত্রিপুরা।

প্রাপ্তিস্থান :—

ত্রিপুরা চন্দ্র সেন, বি কম, বি এল,
এডভোকেট,
আগরতলা, ত্রিপুরা।

প্রথম সংস্করণ

১৩৭২ বাং

মূল্য— চারি টাকা।

গ্রন্থকারের অপরাপর পুস্তক—

গোজেন লামা— মূল্য— দুই টাকা

দুটি পঞ্চম বা

লক্ষী পালা— মূল্য— ২'৫০ পরস।

উত্তেজনা

41/35B, Charu Avenue,
CALCUTTA—33
Date—20.7.60

Dr. Shashi Bhusan Das Gupta, M.A.,
Ph. D, Ramtanu Lahiri Professor
of Bengali Language and Literature
& Head of the Department of
Modern Indian Languages, University
of Calcutta.

শ্রীযুত ত্রিপুর চন্দ্র সেন মহাশয় সংকলিত “গোজেন লামা” বইখানি পড়িয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ ও অতুসঙ্কীর্ণতা আমাকে আনন্দ দিয়াছে। ভবিষ্যতে তিনি ত্রিপুরা ও সম্বন্ধিত অঞ্চলের অধিবাসিগণের সমাজ ব্যবস্থা, ভাষা, প্রাচীন তথ্যাদি বিষয়ে একখানি গবেষণা পুস্তক প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক। তাঁহার এই সাধু সঙ্কল্প ও শ্রমনিষ্ঠা সকলের নিকটেই সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করি। ইতি

স্বাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

সুচি-পত্র

	পৃষ্ঠা
ভূতিকা—	III
Introduction—	IV
প্রথম অধ্যায় :—	স্বর্গদেব রুদ্র সিংহের রণোত্তম— ১
দ্বিতীয় অধ্যায় :—	প্রীতি সংস্থাপক আনন্দিরাম মেধি— ৩
তৃতীয় অধ্যায় :—	ত্রিপুরা রাজার সম্মুখে আসামের দূত— ৬
চতুর্থ অধ্যায় :—	আসামে ত্রিপুরার দূত— ৯
পঞ্চম অধ্যায় :—	স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের সভায় ত্রিপুরার দূত— ১১
ষষ্ঠ অধ্যায় :—	ত্রিপুরার দূতগণের বিদায় গ্রহণ— ১৮
সপ্তম অধ্যায় :—	ত্রিপুরার দূতগণের দুর্গে এসব দর্শন— ২১
অষ্টম অধ্যায় :—	ত্রিপুরায় যাওয়ার পথে যেখানে যাহা আছে তাহার বিবরণ— ২৩
নবম অধ্যায় :—	ত্রিপুরার দূতগণের সঙ্গে আমরা ত্রিপুরায় পৌঁছলাম— ২৭
দশম অধ্যায় :—	ত্রিপুরা রাজ্যের ও রাজধানীর বিবরণ— ২৯
একাদশ অধ্যায় :—	ত্রিপুরা রাজার পূর্বপুরুষদের কথা— ৪০
দ্বাদশ অধ্যায় :—	যুবরাজ চম্পক রাইয়ের হত্য— ৪৭
ত্রয়োদশ অধ্যায় :—	রাজার দৈনিক কাজ— ৪৮
চতুর্দশ অধ্যায় :—	নিজের রাজা হওয়ার জন্য ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের প্রচারণা ও বড়বয়স— ৫০
পঞ্চদশ অধ্যায় :—	ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের হাতী ধরিতে যাত্রা— ৫৬
ষোড়শ অধ্যায় :—	ত্রিপুরার দরবারে আসামের দূত— ৫৮
সপ্তদশ অধ্যায় :—	দূতগণ কর্তৃক আসামের যুদ্ধের বর্ণনা— ৬৮
অষ্টাদশ অধ্যায় :—	ত্রিপুরার নগর পূজা ও মোট খেলা— ৭১
উনবিংশ অধ্যায় :—	রাজার বিরুদ্ধে ঘনশ্যামের সৈন্য সংগ্রহ— ৭৫
বিংশ অধ্যায় :—	ঘনশ্যাম, মুবাদ্ বেগ্ এবং মানুদ ছকির মন্ত্রণা— ৭৯
একবিংশ অধ্যায় :—	রাজধানীর নিকটে সসৈন্তে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর— ৮২
দ্বাবিংশ অধ্যায় :—	যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিবের সং পরামর্শ— ৮৪

		পৃষ্ঠা
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় :—	যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব ঘনশ্যামেব নিকট গেল—	৮৬
চতুর্বিংশ অধ্যায় :—	ঘনশ্যামের হাতে কোতোয়াল মুছিব বন্দী—	৮৭
পঞ্চবিংশ অধ্যায় :—	যুবরাজ গোপনে রাজাকে সমস্ত বিষয় জানাইল—	৮৮
ষড়বিংশ অধ্যায় :—	ঘনশ্যাম রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই পলিষা বওনা হইল—	৯০
সপ্তবিংশ অধ্যায় :—	ত্রিপুরাব সিংহাসনে ঘনশ্যাম বা মহেন্দ্র মানিক্য রাজা—	৯২
অষ্টবিংশ অধ্যায় :—	বাজারে ঘবে আগুন লাগিল—	৯৫
উনত্রিংশ অধ্যায় :—	গঙ্গানাবাগী ধাই বহুমানিক্যকে বধ করিবার জন্তু ঘনশ্যামকে পরামর্শ দিল—	৯৮
দ্বিংশ অধ্যায় :—	বহুমানিক্য রাজা বধ—	৯৯
একত্রিংশ অধ্যায় :—	বহুমানিক্যের মৃতদেহ সংকাব—	১০৩
দ্বাত্রিংশ অধ্যায় :—	মামুদ ছফিব বিদায়—	১০৬
ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায় :—	বংপুবে রাজসভায় মহেন্দ্র মানিক্যের দূত—	১০৭
চতুত্রিংশ অধ্যায় :—	মহেন্দ্র মানিক্যের নিকট দূতযোগে পত্র ও উপঢৌকন প্রেরণ—	১১২
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় :—	ধর্ম মানিক্য আমাদিগকে বিদায় দিলেন— 'ত্রিপুরা দেশের কথা' পুণির নির্গট—	১১৫ ১১৭

INTRODUCTION

This book deals with the Benga'i version of the manuscript named *Tripura Desar Katha*. The manuscript was written by Arjun Das and Ratna Kandali in Assamese in 1724, who were sent three times by the Ahom Raja Rudra Singha to the courts of Raja Ratna Manikya Deb and Raja Mohendra Manikya Deb of Tripura beginning from the year 1709 to 1715 A. D.

The location of the Mss is traced through B. M. Add. 12,235-B, described on P. 1 of J. F. Blumhardt's catalogue of Bengali, Assamese and Oriya Manuscripts in the Library of the British Museum, 1905. For further details of the Mss. it will not be out of place to print here the copy of the letter I received from Mr. W. Zwalf, Assistant Keeper of the British Museum, London, dated the 23rd January, 1964.

Department of Oriental Printed
Books & Mss.,
The British Museum,
London, W. C. I.,
23rd January, 1964.

Dear Sir,

Thank you for the parcel that you recently sent to the Museum. I should like to add to the official acknowledgment my personal expression of gratitude for your kind presentation.

The following are the answers to your questions about the manuscript recently reproduced for you. There are 147 leaves of bark (leaf 108 is missing); they measure 4 inches by $16\frac{1}{4}$; each side contains 5 lines, $12\frac{1}{4}$ inches long. The manuscript was apparently written in the 18th century. There are no paintings, engravings or other form of illustration either in the body of the manuscript or on the cover. According to the records of the Museum, the manuscript was purchased on 8th January, 1842 from a Mr. Rodd. There is no further information about the manuscript or as to the identity of Mr. Rodd, except that he may have been a dealer and not the owner of the item.

I hope that this is satisfactory as far as it goes.

Tripur Chandra Sen,
B. Com, B. L., Advocate,
16/1, Sakuntala Road,
P. O. Agartala, Tripura, India.

Yours faithfully
Sd/ W. ZWALF
(W. Zwalf)
Assistant Keeper

The Mss. had been recorded in Microfilm which has kindly been sent to me by the Museum. I examined and read the Mss. thoroughly. There is nothing indistinct in the Mss. and it can be read easily from the beginning to the end. I have tried to the best of my capacity to translate the contents of the Mss. in Bengali keeping the spirit of the Mss. as far as possible. Raja Ratna Manikya Deb of Tripura and Raja Rudra Singha of Assam thought it proper to establish political relations mutually for the preservation of their own independence against the Moghuls; and as a token of this spirit the initiative of sending emissaries grew up.

Anandiram Mehdi, a Bengali musician, who was intimately connected with Raja Ratna Manikya of Tripura happened to visit Ahom court at Rangpur¹, in connection with his own trade of music. Raja Rudra Singha asked him to establish a relationship between the two governments. Anandiram agreed to this proposal. Ratna Kandali and Arjun Das, though accompanied Anandiram to his home on the pretext of bringing the Ganges water for Barbarua Surath Singha, a very influential member of the Ahom court, were actually sent for fulfilling the aforesaid purpose.

Raja Ratna Manikya sent for Ratna Kandali and Arjun Das when he was informed by Anandiram Mehdi about the arrival of these two eminent persons, and on their appearance before him, he requested them to accompany the Tripura emissaries viz Rameswar Bhattacharyee Nayalankar and Udai Narayan Biswas to Ahom court. The Tripura Deputation consisting of ten followers

¹ The present name of the place is Nazira. It is situated at the South-West of Sibsagar Town.

including a physician left Udaipur in June-July, 1710-A. D. in the company of the Assamese emissaries. On the way, the Tripura envoys halted at Khaspur, the capital of Kachar and presented their credentials to the Kachar Raj Durbar*. They arrived at Gaipur about an year after their starting from Udaipur and presented the letter and presents of Ratna Manikya to Barbarua Surath Singha who assured the Tripura emissaries of rendering all aid to make the mission a success.

Raja Rudra Singha received the Tripura envoys on C. August 12, 1711 A. D. at his the then capital Rangpur amidst grandeur and ceremony befitting to the occasion. On C. November, 18, 1711, the Ahom envoys started again for the capital of Tripura with the letters and presents from the Ahom Raja Rudra Singha and Barbarua Surath Singha to Raja Ratna Manikya along with the Tripura party. Thirty four paiks were engaged by the Ahom Government to accompany their agents. The combined party, after crossing Kachar Raj territory reached the mouth of the Rupini river which was the common boundary of Kachar and Tripura Raj territory and after that they had to cross over the mountain tracts of Tripura viz Rangrung, Taijalpara, Kumjung, Sairangohuk, the Deogang river, the Manu river, Kerpa, Chota Maricharai, Bata Maricharai and Khakrai. From Khakrai, the envoys went on horse back to Udaipur and reached there by the end of March, 1712. Rangrung was the extreme north-east border of the then Tripura kingdom and its market was frequented by the Manipuris and the Kacharis with their commercial commodities.

On C. April 25, 1712 Ratna Manikya received the Assamese envoys in open Durbar. Before attending the Durbar, the Assamese envoys engaged two spies to note and measure the strength of Tripura Raja in disguise. This book unfolds the part of the informations supplied by those spies to the Assamese emissaries. This is the second visit of the Assamese envoys to Tripura Durbar.

* Tamra Dhwaia Narayan was the Raja of Kachar at that time.

Three days after the open Durbar at Udaipur, the Assamese emissaries were allowed private audience by Raja Ratna Manikya at night when they delivered a confidential letter of Raja Rudra Singha to him.

While the Assamese envoys were waiting for the ceremonial Durbar of Ratna Manikya to begin, Ghanashyam Deb Barthakur, the step brother of Ratna Manikya, conspired with Murad Beg, an influential Mughal, who was an employee under Ratna Manikya, to capture the throne of Tripura. Murad Beg was sent to Dacca who recruited Bakasias (Hindoostani itinerant soldiers) for Ghanashyam and secured the help of Mahmud Sapi who was an employee under Mir Murad, a high Mughal officer at Dacca. Ghanashyam waited for a long time out of the town of Udaipur on the pretext of capturing wild elephants. Owing to unreserved faith of Ratna Manikya in his brother Ghanashyam, he did not believe any of the reports about the conspiracy which reached him. Ghanashyam succeeded in his plan and became the Raja of Tripura and assumed the title of Mahendra Manikya on C. May 19, 1712. This change took place while the Assamese envoys were staying at Udaipur.

On C. Aug. 2, 1712, Mahendra Manikya received the Assamese envoys formally. Ari Bhim Naran was sent as an envoy of Tripura Raja in January 1713, to Ahom court with letters and presents to Barbarua Surath Singha and Raja Rudra Singha. The Tripura envoy was formally received there on C. Jan. 15, 1714, at Rangpur. This is the second mission of Tripura Government to Ahom court.

On April, 1714, the same Assamese envoys started for Tripura on their third mission and were accompanied by Ari Bhim Naran, the Tripura envoy. This party reached Udaipur in January, 1715. In the meantime, Mahendra Manikya died of the disease of grahani after ruling for one year and two months and Durjoy Singha, who was Jubraj during the reign of Ratna Manikya and Mahendra Manikya, succeeded to the throne assuming the name of Dharma Manikya.

The Assamese emissaries were received in Tripura Durbar in May, 1715. This is the 3rd Assamese Mission to Tripura Durbar. The party was allowed to return back to Rangpur with presents and letters to Raja Rudra Singha and Barbarua Surath Singha. Dharma Manikya assured his general friendship to the Ruler of Assam but he did not send any emissary at this time to Ahom court. This is apparent that the Mss. was written by the two Assamese emissaries with a view to submitting their report to the Ahom court as to the true political and financial position of their neighbouring country of Tripura, which informations could be used if any occasion would arise for the joint action of the Governments of Assam and Tripura against the Mughals.

The authors narrated the index of the chronicle in four folios by the end of the Mss. The topographical account and the side lights on the social and political organisation of the country are rarely found in any other book. It contains true and vivid pictures of the Royal courts of Assam and Tripura, besides the manners and decorum used to be observed therein. The top-heavy set-up of the Government of Tripura and the burning of the widows are depicted with care. The state-festival of Madan Puja (the worship of Eros) was also prevalent in Tripura like other places e. g. Rangpur (Bengal) Dhubri, Kochbihar and Jalpaiguri. This was the greatest festival of the Rajbansis used to be held outside their villages on the Sukla Troyodasi of the month of Chaitra. The power mongering of the nobilities of Tripura and their concerted efforts to drive out the existing rulers are the striking features of this book. The characters of Rajdurlav Naran, the Kotwal Musib, Champakrai, the Jubraj and of Durjay Singh Thakur are ideals of loyalty. The brief account of the events of the country & the political relation with the neighbouring Mughal government of Dacca between 1626 to 1715 may be stated here as follows :—

Being agreed to pay regular tribute to the Mughals, Kalyan Manikya, ascended the throne of Tripura at 1626 A. D. He

struck coins in the name of Siva and his own and offered charity to the Brahmins. He constructed the temples of Gopinath at Udaipur within the precincts of Mahadev Bari in 1572 Saka and of Jaykali within the fort of Kowaligarh. ³ It took about 28 years after his reign to complete the temple. He brought the diety of Kali on an elephant's back from Dharmagar through Ahmedpur (Sylhet District). Dharmagarh was formerly a religious centre of tantric Buddhists. At Ahmedpur, where the diety and carrying elephant took rest, another place of worship grew up afterward.

Kalyan Manikya stopped payment of revenue to the Mughal Government afterwards and hence Shuja invaded Tripura.

[Tripura is a country extremely strong by reason of abundance of its trees, the loftiness of its forts, and the difficulty of its roads. The Raja is proud of his strength and the practices of conchblowing and idol worship prevail there. Sultan Shuja during his governership of Bengal, left his eldest son Zain-ud-din Md. as his deputy in Rajmahal, came to Dacca, and sent his chief minister Jan Beg Kh. towards Tipara ; but the Khan's men failed to take any of the forts of that country even after labouring for one year. At last he had to content himself with annexing the district of Mirzapur, ⁴ and making it the frontier of the imperial dominions. Many of his soldiers died of disease from the badness of the air.] ⁵ Shuja was appointed Governor of Bengal in April 1639 at the age of 24 years. He served in the post up to April 1660 continuously excepting for 2 years i. e. from March 1647-March 1648 and March 1652—September 1652, when he worked as Governor of Kabul. This event took place during the first period of his governorship when Tripura army was defeated. The Mughals brought with them a famous cannon made of leather.

3. At present, it is known as Kamalasagar.

4. It is situated at about three miles north-east of Kamalasagar in Comilla District.

5. Naubahar-i-Murshid Quli Khani as translated by Jadunath Sarkar in Bengal Past and Present-vol. LXIX, Serial No. 132 page 1.

In the Revenue Records of Bengal Subah prepared at the time of Sultan Shuja in 1580 Saka (1658 A.D), Sarkar Udaipur was recorded as a revenue paying centre.⁶ After the said conquest of Prince Shuja a Mosque was constructed at Comilla in his name and a vill ge named Shujanagar was gifted to the Mosque as its wakf property.⁷

Kalyan Manikya in his donation plate of 1573 Saka, wrote thus—"Sasti Sri Srijut Kalyan Manikya Deva Bisma Samar Bijayee Mahamohodoise Rajanama desoyang Sri Karkonbargo Birajate Hanat param Rajdhani Hastinapur Sarkar Udaipur parganna N. rnagar Mouja Baurkhand etc etc .." ⁸

Henceforth all the Rajas of Tripura wrote the same language in their grants and deeds which means their subjugation to Maghal authority. The word 'Karkonbargo Birajate' means in the midst of the scribes or ministers. The word 'Rajnama desoyang' means that he is called a Raja within the country. So we find that the word "Karkonbargo samaghyeon etc." in the donation plate of Mirja Murad Beg, a zaminder of Muradnagar (in Comilla Distret) dated 1123 sana. 1 Kartic. ⁹

About this time, the then Dutch Governor Vanden Broucake aptly writes "The countries of Oedapur and Tipera are sometimes Independent, sometimes under the great Mogul and sometimes even under the king of Arakan".

Afterwards Kalyan Manikya observed the ceremony of Tula and distributed silver and gold of his own weight to the Brahmins. He died at 1659 A.D.

After the death of Kalyan Manikya, his eldest son Gobinda became Raja of Tripura. His wife struck golden coins, On one side of it, the inscription of Siva and the name of the Raja and on the other side, her own name appeared. He had four other brothers viz Nakhatra Rai, Jagannath Jadav and Rajballav.

6.	Rajmata by K. C. Singha	P. 84
7.	" " "	P. 94
8.	" " "	P. 592
9.	" " "	P 560

Gobinda Manikya ruled Tripura for some time when his brother Nakhatra Rai went to Dacca in order to overthrow Gobinda Manikya with the help of the Mughals. Nakhatra promised the Mughals to send two elephants annually and also to keep a surety at Dacca and obtained the Mughal army in his aid in return. Nakhatra was successful in dethroning Gobinda Manikya and became the Raja of Tripura at Udaipur and assumed the title of Chatra Manikya. Chatra Manikya was born to the married wife of Kalyan Manikya after Kalyan Manikya became the Raja of Tripura and so he thought his right to the throne was superior to others. Chatra Manikya ruled for two years only when the nobilities of the Durbar conspired with Gobinda to dethrone Chatra Manikya. During the short rule of Chatra Manikya Gobinda always remained at home concealing himself completely. During this period of two years, he was busy in conspiring against Chatra Manikya. When Gobinda's conspiracy became mature, he killed Chatra Manikya and became Raja of Tripura again.

Being afraid of Gobinda Manikya, Chatra Manikya's family and his near relatives left Tripura for ever and constructed a house at Rajar Deori within the town of Dacca and lived there permanently. On one side of the coins of Chatra Manikya, it is written thus—"Sri Sri Haragouri pade Maharaj Sri Srijut Chatra Manikya Deba" and on the other side "Saka 1582" below the inscription of a lion.¹⁰

Jean Baptist Tavernier, a French Merchant came to Dacca at this time and he wrote thus, "Nothing is produced in Tipperah which is of use to foreigners. There is, however, a gold mine, which yields gold of very low standard ; and silk, which is very coarse. It is from these two articles that the king's revenue is derived. He levies no revenue from his subjects, save that those below the rank, corresponding to that of the nobility of Europe, have to work for him for six days every year either in gold mine

or at the silk. He sends both the gold and silk to be sold in China, and receiving silver in return, with which he coins money of the value of 10 sols. He also coins small gold money like the aspries of Turkey and has two kinds of them, of one of which it takes four to make an anna, and of the other it takes a dozen". ¹¹

Utsab Ray, the son of Chatra Manikya obtained the Zemindary of Kudba, Bedrahal, Anirabad and Lohar in Noakhali District from the Mughal Government.

Gobinda Manikya constructed the embankment of the river Gomti which helped the preservation of the crop on it, both sides. He reclaimed land at Meherkool and constructed one temple for God "Chandranath" at Sitakunda hill. He presented salt to the people of Udaipur and settled land to the Brahmins at cheap rate. His settlement deeds were written in Bengali on copper plates. One Biswas Naran was the Uzir of Gobinda Manikya Jagannath, the father of Champak Raj, was his full brother.

Gobinda Manikya died at 1669 A. D.

After Gobinda Manikya's death, his son Ram Manikya ascended the throne. Ram Manikya created the post of Barthakur for efficient administration. He plundered Chittagong once with his army being guided by a Mughal officer. He got the temple of Tripureswari repaired in the year 1603 Saka. According to the plate which is attached to the eastern wall of Tripureswari Temple at Udaipur, Ram Manikya's full name was "Sri Ranagan Ram Manikya Dharma Raj Pati". He was known as 'Dharma Raja' popularly. During and before the reign of Kalyan Manikya, the territory of Kailasahar Dvn. was lost and came under the Mughal rule of Sylhet and a Karkon was posted at Fatikroy to manage the territory. The name of the place Fatikroy is derived from the name of Fatikroy, the Karkon. Fatikroy was the son of

11. Travels in India by Jean Baptiste Tavernier by V. Ball, vol II ; as published by Mac Millan and Co, London. P. 275 & 276.

Sona Roy, the Karkon.¹² The Karkons were known as Kankhoi locally. Ram Manikya sent two Pathan warriors named Sher Mustafa Khan and Amal Khan along with some soldiers to wipe out Tilok Roy, the last Karkon of this line. The Tripura soldiers roamed over the hills on the pretext of hunting. Suddenly they attacked the house of Tilak Roy and killed all of his family members and his retainers.¹³

Thus the present Kailasahar and Dharmanagar divisions of Tripura came again under the rule of the Maharaja of Tripura. Sher Mustafa brought his barbar and washerman from Delhi along with his family and their descendants are now settled at Kail sahar. Md. Kasir Mahmud Chowdhury was a renowned man of this line.

Balubhim Naran, the brother-in-law of Ram Manikya acted as Jubraj for sometime. Champak Rai the son of Jagannath was appointed Jubaraj because of his superior qualities.

Ram Manikya died in 1683 A. D.

After the death of Ram Manikya, Ratna Manikya ascended the throne in C. 1683 A. D. at the age of seven years only. and Jubaraj Champak Rai administered the Government on his behalf. Sometime after, Narendra Deb with a view to become Raja himself went to Dacca to secure the Mughal help. He promised the Mughal Governor at Dacca to send two more elephants annually over the prevalent annual presentation of elephants and also one for the Governor himself. Thus the annual presentation of elephants numbered four. The Mughal army came to Udaipur and Narendra was installed on the throne of Tripura with the title of Narendra Manikya. Champak Rai fled to Dacca. Very soon, the nobilities conspired against Narendra Manikya and requested Champak Rai to come with the Mughal army to dethrone Narendra Manikya.

12. Fatik Royer, Itihash Samaj Patrika, dated 25th Feb. 1956

13. Sri Sri Juter Kailasahar Bhraman (Bengali) by Chandroday Bidhyabinode.

Champak Rai did accordingly and Narendra Manikya was defeated at a war at Chandigarh. Narendra Manikya did not do any harm to Ratna Manikya, rather he took care of him during his short reign. Narendra Manikya took shelter into the hills but was afterwards arrested and killed by the order of Champak Rai. Champak Rai installed Ratna Manikya again to the throne of Tripura at Udaipur. This event took place at about 1686 A. D.

Champak Rai began to rule the country with courage and wisdom and stopped sending of elephants to Dacca. 'The son of Ram Manikya Raja, Zemindar of Tipperah for a while appears to have been wholly shaken of the Mogul yoke virtually, being only liable to a nominal tribute of 25,000 rupees for the pergunah of Noornagar, which at the sametime, was entirely remitted to himself in the form of a military Jaigeer from the Court of Delhi' ¹⁴

Champak Rai while residing at Dacca connected himself to the temple of Gooptipara in Hoogly District and patronised the institution. He was a Sakta in his religious belief. His admirers like Chandrachur Brahmachari who composed the annotation (Kalipakshya-Tika) of Bidhya-sundar Kabya styled Champak Rai as Maharajadhiraj Champak Roy Mahinath. The sandas issued by Champak Rai may be seen with the talukdars of Nurnagar. Champak Rai was murdered in a conspiracy in which some members of the royal family were implicated.

After the death of Champak Rai, Ratna Manikya nominated Durjaysingh Deb as Jubaraj and Ghanashyam Deb as Barthakur who were his step-brothers by different mothers. Sanads of Ratna Manikya and of other Rajas may be seen at the houses of jotedars at Kailasahar. Round seals containing the names of previous Rajas had been set on the bodies of them like the insignias of the Mughal Badsas.

From 1608 to 1703 A. D. Dacca was the Mughal Capital of

14 Grant's view of Revenues of Bengal. (Fifth Report, P. 365—96.)

Bengal and after that the entire Diwani staff and the agents of the Zamindars were transferred to Murshidabad. Hearing the power of Murshid Kooly Jafar Khan (1707-25), Ratna Manikya used to send elephants, wrought and unwrought ivory and various other articles as presents to him at Murshidabad in the expectation of peaceful co-existence. Murshid Kooli in return sent Ratna Manikya khelaats or honorary dress, by the receipt of which Ratna Manikya acknowledged the Mughal's superiority. This interchange of presents and khelaats became an annual custom during the whole of Murshid Kooli's administration.

Mahendra Manikya became Raja of Tripura on the 29th of Baisakh of 1634 Saka (C May 19, 1712) and on the fourth day of his accession, he struck coins in his name and cut Kotwal Musib Raj Durlav Naran on this occasion. Very soon Mahendra Manikya murdered Ratna Manikya when the Mughal soldiers were still residing at Udaipur. Mahendra Manikya appointed Durjaysingh Deb as Jubaraj and Chandra Mani Deb as Barthakur. Mahendra Manikya died by the end of July 1713 and Durjaysingh Jubaraj ascended the throne. His reign was full of events.

It is to be mentioned here that with the help of the same Mss. of the British Museum, Rai Bahadur S. K. Bhuyan wrote a book 'Tripura Buranjee'.

In writing this book, I owe much to Mr. W. Zulf, the Asst. keeper of the British Museum, for his helping me in all respects in obtaining the Mss.; to Mr. J. J. W. Simpson, Photographic Service, The British Museum for recording the microfilm nicely; to Sreejut Ram Kanta Barthakur, Senior Accountant, Air Training centre, Chardwar, Assam, for his helping me in determining the correct implications of old Assamese words; to Sreejut B. K. Bhattacharjee M. A. LL. B. Advocate, Agartala for his assisting me generally and Social Education Dept., Education Directorate, Tripura for their making arrangements for studying the said microfilm and I offer them my sincerest and heartfelt thanks.

The 1st August.
1964, Agartala,
Tripura.

Tripur Chandra Sen.

ত্রিপুরা দেশের কথা

প্রথম অধ্যায়

স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের রাণাভ্যুত্থান

৬ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ । রত্ন কন্দলী, অর্জুন দাস এই দুইজন রাজকৃত দ্বারা ‘ত্রিপুরা দেশের কথা’ লেখা হইল । মহারাজা রুদ্রসিংহ জয়ন্তা ও কাছাড় দেশ জয় করিয়া মুসলমানের হাত হইতে বাংলা দেশ উদ্ধার করিবার জন্ত উদ্যোগ কবিত্তে লাগিলেন । তাবপর বা লার মোরঙ্গের রাজা, বনবিষ্ণুপুরের রাজা, নদীয়ার রাজা, কোচবিহারের রাজা, বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচন্দ্র, বরাহনগরের জমিদার উদয় নারায়ণ—এই সকলের নিকট বড়ফুকনের নামে দূত পাঠাইলেন এবং তাহাদের লোক এদেশে আনাইলেন । এইভাবে রাজা ও জমিদারদের যে সমস্ত লোক আসিল বড়ফুকন মহারাজকে জানাইয়া তাহাদিগকে মহারাজার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং সেই সকল রাজা ও জমিদারদের জন্ত উপঢৌকন ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পত্র দিয়া তাহাদিগকে আমাদের লোক সঙ্গে দিয়া পুনরায় দেশে পাঠাইয়া দিলেন । এইভাবে লোক যাতায়াতের ফলে সেই সমস্ত রাজা জমিদারগণ রুদ্রসিংহের বশীভূত হইল । রুদ্রসিংহ তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন — “আমরা হিন্দু রাজ্যগণ

বর্তমান থাকিতে যখনে ধর্ম নষ্ট কবিতোছে। এই কাণে যদি আমবা সকলে একমত হইয়া যখনকে দমন করিয়া ধর্ম বক্ষা কবি তবে কি ফল হয় তাহা আপনাবা সকলেই জ্ঞাত আছেন।” এই কথা বলিয়া তিনি ঐ সকল বাজা জমিদারদেব কাছে লোক পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাবাও কদ্রসিংহব এই কথা সাধ দিলেন।

তাবপব মহারাজা কদ্রসিংহ নিজেব দেশেব তীব, ধনু, ঢাল, তলোয়াণ, গুলি, গাদা বন্দুক, বারুদ, নৌকা ইত্যাদি এবং নিজেব ভাণ্ডাবেব অস্ত্রশস্ত্র হিসাব করিয়া দেখিলেন এবং আবও অনেক তৈয়ারী কবাইলেন। লোকজনের সুবিধা অসুবিধা বিচার কবিয়া প্রধান যোদ্ধা দ্বাবা প্রধান ও সহায়ক সৈন্য দলেব লোকদেবও তীব, ধনু এবং বন্দুক মাঝা শিখাইলেন। হাতীব চমক ভাজাইলেন। সিপাহীদের ঘোড় সওয়ারেব যুদ্ধ শিখাইলেন। কদ্রসিংহ এইরূপে সব বকমে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মুসলমানের দেশ জয় করিবাব উদ্দেশ্যে যে একপ করা হইতেছে তাহা লোকে জানিতে পারিল না।

এইরূপে বিদেশী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বৈজ্ঞ, গুনী গায়ক, কাবিগব এবং সাহা মহাজনেব লোকদেব আনাইয়া সকলকে নানা বকমেব দ্রব্যাদি দিয়া সন্তুষ্ট কবিয়া পুনঃ তাহাদেব বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন। প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যাহাবা আসেন নাই তাহাদেব জন্ত সোনা কপা পাঠাইয়া দিলেন। তাহাবা নিজ নিজ দেশে থাকিয়া বাজাকে আশীর্বাদ কবিলেন। এইরূপ উপঢৌকন দেওয়াতে বাংলা দেশে মহাবাজা বড় বাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তারপর সেই স্থানেব লোকজন লাভেব আশায় আসাম রাজ্যে যাতায়াত আরম্ভ করিল, যাহাবা আসিল মহারাজা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া রিদায় দিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রীতি সংস্থাপক আনন্দিরাম মেধি

এইকপে মহারাজাব যশঃকীর্তন শুনিয়া আনন্দিরাম মেধি রাজধানীতে আসিলেন। মহারাজ ভট্টাচার্য পাড়ার পুত্ৰবেব পাড়ে তাঁহাব থাকিবাব স্থান এব খাওয়ার আয়োজন নিৰ্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। তাবপব মহারাজ বংপুবেব দোল যাত্রাব মন্দিবেব নিববেব ঘবে তাহাকে অভ্যর্থনা কবিলেন। মেধিও মহারাজকে আশীৰ্বাদ কবিলেন। মেধি মহারাজেব জ্ঞাত যে ভেট আনিয়- ছিলেন তাহা মহারাজকে দিলেন। পবে মহারাজেব আদেশে দুতেরা আসন পাতিয়া দিলে আনন্দিরাম তাহাতে বসিলেন। তাবপব মেধি মহারাজেব সম্মুখে স কীর্তনের গায় গান কবিলেন, বাঁশী বাজাইলেন এব আড বাঁশী তাতে লইয়া নৃত্য কবিলেন। এইকপে মহারাজ সেইদিন আনন্দ ভোগ কবিয়া মেধিকে তাঁহাব বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। সংকীর্তন শিক্ষা কবিবাব জ্ঞাত আমাদেব এখানেব সঙ্গীতজ্ঞদেব মহারাজা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

মহারাজাব পিতা গদাধব সিংহের গয়াশ্রাদ্ধ কবাব জ্ঞাত তর্কবাগীশ ভট্টাচার্যকে পূর্বে পাঠান হইয়াছিল। তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য গয়াশ্রাদ্ধ কবিয়া ফিরিয়া আসাব সময়ে ঢাকায হুবংশ রাযের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিলেন। পবে মহারাজ রত্নকন্দলীকে ভট্টাচার্যের নিকটে

পাঠাইয়া দিলেন। ভট্টাচার্য্য আবার রত্নকন্দলীকে রাঙ্গা মাটি হইতে সুবংশ রায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন “শুশী-গায়ক যাহা পাওয়া যায় সেখান হইতে সঙ্গে করিয়া আনিও।” পরে রত্নকন্দলী সুবংশরায়ের নিকট গেলে সুবংশরায় রত্নকন্দলীকে বলিলেন, “শুনিয়াছি রুদ্রসিংহ মহারাজা জয়ন্তিয়া ও কাছাড় দেশ জয় করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া লইয়াছেন। ত্রিপুরার রাজা একজন বড় রাজা। তাহার সঙ্গে প্রীতি স্থাপন করিয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া লইলে অনেক কার্য্যে স্বর্গদেব তাহার সাহায্য পাইবেন।” পরে সেই কথা রত্নকন্দলী আসিয়া মহারাজাকে জানাইলেন। এই কথা মহারাজার স্মরণ ছিল।

তারপর মহারাজা মেধিকে ত্রিপুরার রাজার সহিত তাহার প্রীতিভাব আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। মেধি বলিলেন, “ত্রিপুরার রাজা রত্ন মাণিক্যের নিকটে আমি গিয়াছিলাম; তাহার সঙ্গে আমাব অত্যন্ত প্রীতি আছে।” তখন মহারাজা আবার বলিয়া পাঠাইলেন “যদি মেধির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজার প্রীতি থাকে তবে মেধি আমি পাঠাইয়াছি এই কথা গোপন রাখিয়া দূত যোগে পত্রদ্বারা ত্রিপুরার রাজার সহিত আমার প্রীতি সংস্থাপন করুক।” তখন মেধি মহারাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে “মহারাজার দূত আমার সঙ্গে যাইবে। আমি তাহাদিগকে আমার বাড়ীতে লইয়া গিয়া ত্রিপুরার রাজার নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইব। যদি ত্রিপুরার রাজার স্বর্গদেব মহারাজার সঙ্গে প্রীতি করিবার ইচ্ছা থাকে তবে আমি স্বর্গদেব মহারাজার লোকদের সঙ্গে লইয়া গিয়া ত্রিপুরার রাজার কাছে উপস্থিত হইব এবং যাহাতে ত্রিপুরার রাজা দূতের সঙ্গে পত্র দিয়া প্রীতি সংস্থাপন করেন আমি সেই চেষ্টা করিব।” পরে স্বর্গদেব মেধিকে বিদায় দেওয়ার সময় নিজের জিনিসগুলি দিলেন— হাতী একটি, সোনার খাড়ু, বালা, কানফুল ও কোঁটা এবং রূপার থালা, তাওকিন, বাটি ও পানের বাটা। তাহা ছাড়া সোনা, রূপা ও অনেক

পরিমাণে দিয়া মেধিকে সন্তুষ্ট করিলেন। তারপর রত্নকন্দলী ও অজুনকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া বিদায় দিলেন।

মেধি তাহাদিগকে বাড়িতে লইয়া গিয়া ত্রিপুরার রাজার নিকট লোক পাঠাইয়া সংবাদ জানাইলেন। ত্রিপুরার রাজা এই সংবাদ শুনিয়া “আনন্দিরাম মেধিকে সত্ত্ব নিয়া আস” এই কথা বলিয়া দুইজন ভাল লোক পাঠাইয়া দিলেন। সেই দুইজন লোক আসিয়া মেধিকে লইয়া গেল এবং আমাদিগকেও সঙ্গে করিয়া লইল। রাজধানীতে (উদয়পুরে) পৌঁছিলে আমাদিগকে থাকিবার জগু বাসা দেওয়া হইল। বাঙ্গালী নিয়মে আমাদের সিধা দেওয়া হইল। আমরা মেধিকে বলিলাম মহারাজ কদ্রসিংহ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন একপ বলিবেন না। বড়বুয়া নবাব গঙ্গাজল নেওয়ার জগু আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন এইকপ বলিবেন।” তারপর মেধি ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের নির্দেশমত কদ্রসিংহ মহারাজার গুণকীর্তন করিলেন এবং বলিলেন যে স্ব দেব মহারাজার সঙ্গে প্রীতি সংস্থাপিত হইলে ত্রিপুরার মহারাজের অনেক কার্যোই সুবিধা হইবে। রত্নমাণিকা রাজা কদ্রসিংহের গুণকীর্তির কথা শুনিয়া তাহার সহিত প্রীতি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন “তাহাদের দেশে আমাদের লোক কখনও যাতায়াত করে নাই, আমাদের লোক কিরূপে সেখানে যাইবে?” তখন মেধি বলিলেন “বড়বুয়া নবাব গঙ্গাজল লইয়া যাইবার জগু দুইজন ভাল লোক পাঠাইয়াছেন। মহারাজের ইচ্ছা হইলে তাহাদের সঙ্গে আমাদের দূত পাঠান যাইতে পারে।” তখন রাজা মেধিকে বলিলেন “সেই লোকদের আমার কাছে নিয়া আস।” এই কথা বলিয়া মেধিকে আমাদের বাসায় পাঠাইয়া দিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রিপুরা রাজার সম্মুখে আসামের দূত

পরে মেধি আমাদের কাছে নিযা রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইলেন। তখন রাজা দেওয়ানকে দিয়া আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করাইলেন “তোমরা কি কাজের জন্য আসিয়াছ?” আমরা বলিলাম, “বড়বড়ুয়া নবাব গঙ্গাজল লইয়া যাইবাব জন্য আমাদেরকে পাঠাইয়াছেন।” দেওয়ান বলিলেন, “স্বদেশে রাজার সঙ্গে আমাদের মহারাজার প্রীতি করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। দূতযোগে পত্র দিলে তোমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে কি?” তখন আমরা বলিলাম “অনেক রাজারা প্রীতি স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বড়বড়ুয়া নবাবের কাছে মানুষ পাঠায়, পরে বড়বড়ুয়া নবাব স্বর্গ মহারাজকে জানাইয়া তাঁহার সহিত প্রীতি স্থাপন করায়। যদি আপনাদের এইরূপ ইচ্ছা থাকে তবে আমরা বড়বড়ুয়া নবাবকে জানাইতে পারি।” পরে মেধির সঙ্গে আমাদেরকে বাসায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। আমাদের দুইজন (রত্নকন্দলী ও অর্জুন) কে সিঁধা পাঠাইয়া দেওয়া হইল। রাজা বড়বড়ুয়ার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। আমরা বলিলাম যে আমাদের বড়বড়ুয়া নবাবের নাম হুরত মুসিহ। তারপর ত্রিপুরার রাজা রুদ্রসিংহ মহারাজার নামে প্রীতিপূর্বক পত্র লিখিলেন এবং বড়বড়ুয়া নবাবের নামেও একটি পত্র লিখিলেন। আসাম রাজদরবারে ত্রিপুরার

দূত পাঠান স্থির হইল।

রাজার আদেশে আনন্দিরাম মেধি আমাদের দুইজনকে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করাইলেন। বড়ঠাকুর বলিলেন—“রত্নকন্দলী, অর্জুনদাস, তোমরা বড়বড়ুয়া নবাবের কাছে বলিও যে পূর্বে স্বর্গদেব মহারাজার সঙ্গে আমাদের শ্রীতি বা অশ্রীতি কিছুই ছিল না। বর্তমানে আমাদের মহারাজা স্বর্গদেব মহারাজার সঙ্গে শ্রীতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে দূত যোগে পত্র ও উপঢৌকন পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যে প্রকারে এই শ্রীতির বন্ধনটি স্বেচ্ছাক্রমে সম্পন্ন হয় তাহা করিও।” আরও বলিলেন, “সমস্ত কাজ রাজমন্ত্রীরাই কবে। তোমরা স্বর্গ রাজার বিজ্ঞ মন্ত্রী, যাহা উচিত হয় তাহাই করিও।” তখন আমরা দুইজনে বলিলাম, “ঠাকুর সাহেব, আমাদের কাছে যেকপ আদেশ করিলেন আমরা সেইকপ ভাবে বড়বড়ুয়া নবাবের নিকট জানাইব।” তারপর বড়ঠাকুর আমাদের দুইজনকে পান-সুপারি দিয়া আমাদের বাসায় পাঠাইয়া দিলেন।

পরে মেধির সঙ্গে আমাদের সঙ্গে রাজার সভায় নিলেন এবং রামেশ্বর খ্যায়ালদার ও উদয়নাথায়গকে সেখানে আনাইয়া এবং সমস্ত কিছু অবগত করাইয়া রাজার আদেশে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন—“রত্নকন্দলী, অর্জুনদাস, আমাদের মহারাজা স্বর্গদেব মহারাজার সঙ্গে শ্রীতিস্থাপনের ইচ্ছা করিয়া রামেশ্বর খ্যায়ালদার ও উদয়নাথায়গকে পত্র ও উপঢৌকনসহ আমাদের সঙ্গে দিয়াছেন। এই পত্র ও উপঢৌকন সহ আমাদের দূতগণকে তোমরা বড়বড়ুয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইও। স্বর্গদেব মহারাজার নিকটেও পত্র ও উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছে। ঐ পত্র ও উপঢৌকন সহ বড়বড়ুয়া নবাব আমাদের দূতগণকে স্বর্গদেব মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইবেন। যাহাতে এই শ্রীতির বন্ধনটি বিনাধায়া উত্তরোত্তর দৃঢ় হয় তাহাই করিও।” তখন আমরা বলিলাম “মহারাজ আমাদেরকে যে সমস্ত আদেশ দিয়াছেন তাহা আমরা বড়বড়ুয়া নবাবের নিকট জানাইব।” তারপর রাজা আমাদের জন্য আতলকের জামা, সোনালী কাপড় করা

জিরা, এবং রূপার ঝালর দেওয়া পটুকা উপহার দিলেন। তাহা ছাড়া আমাদের ছইজনকে ৪০টি রূপার টাকাও দিলেন। তারপর আমাদেরকে রাজা পান-সুপারি, ফুল-চন্দন দিয়া বিদায় দিলেন। কাছাড় রাজ্যের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে বলিয়া কাছাড়ী রাজার জ্ঞা পত্র ও উপঢৌকন ত্রিপুরার দূতগণকে নিকট দেওয়া হইল। কাছাড়ী রাজার জ্ঞা দেওয়া উপহারের ফিরিস্তি—পাথর খচিত ছগ্‌ছগী একখানা, কিংখাব একখানা।

১৬৩২ শকাব্দের আষাঢ় মাসে ত্রিপুরার রাজা আমাদের সঙ্গে দূত পাঠাইয়া দিলেন। তারপর আমরা ত্রিপুরার দূতগণকে সঙ্গে লইয়া ত্রিপুরার রাজধানী হইতে আট দিনের পথ আসিয়া কৈলাসহর পরগণায় বর্ধাকালে উপস্থিত হইলাম। তখন সঙ্গের লোকজন অস্থস্থ হইয়া পড়িতে সেখানে চারি মাস কাল থাকিতে হইল। আমরা সেখান হইতে রওনা হইয়া কাছাড়ী রাজার রাজধানী খাছপুরে পৌঁছলাম। কাছাড়ী রাজা ত্রিপুরার রাজার দূত ছইজনকে দরবারে অভ্যর্থনা করিলেন এবং দূতগণ কাছাড়ী রাজার পত্র এবং উপঢৌকন তাহাকে দিলেন। কাছাড়ী রাজার নিকট পত্র দেওয়ার সময়ে পত্রে ত্রিপুরা রাজার নাম লেখা হয় নাই। কারণ পত্রে ত্রিপুরা রাজার নামের নীচে কাছাড়ী রাজার নাম লিখিলে কাছাড়ী রাজা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন এবং কাছাড়ী রাজার নামের নীচে ত্রিপুরা রাজার নাম লিখিলে তাহাও অস্বীকৃত হয়। এই জগুই পত্রে ত্রিপুরা রাজার নাম দেওয়া হয় নাই। পত্রের উপর ত্রিপুরা রাজার নামের মোহর হইতেই ত্রিপুরা রাজার পত্র বুঝাইবে—এইরূপ স্থির করিয়া কাছাড়ী রাজার পত্রে ত্রিপুরা রাজার নাম না দিয়া নামের মোহর দেওয়া হইয়াছিল। কাছাড়ী রাজার সম্মুখে পত্র পড়া হইলে রাজা বলিলেন, “পত্রে ত্রিপুরা রাজার নাম নাই, এই পত্র কাহার কিরূপে বুঝা যাইবে?” ত্রিপুরার দূতগণ বলিলেন, “এ পত্রে আমাদের রাজার নামের মোহর আছে, তাহাতেই এই পত্র যে ত্রিপুরা রাজার পত্র তাহা বুঝা যাইতেছে। যেখানে পত্রের গর্ভে রাজার নাম লেখা থাকে না সেখানে এইরূপ পত্র ব্যবহারের নিয়ম আছে।”

তারপর কাছাড়ী রাজা ত্রিপুরার দূতগণকে তাহাদের থাকিবার জায়গায় পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাদের জন্ত সিঁদা এবং সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্ত পত্র দিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

আসামে ত্রিপুরার দূত

কাছাড়ী বাজাব দেশ হইতে আসিয়া আমরা রহায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে বহাব চকীয়াল আমাদের থাকিবার জন্ত বাসা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল। সেখান হইতে মহাবাজাব আদেশে সলাল বড় গৌহাইয়ের লোকেবা আমাদের নৌকা ও লোক দিয়া আনাইলেন। সলালের লোকেবা কলিয়াববে আমাদের থাকিবার জায়গা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। খাবৈতে মবঙ্গিয়ালেরা আমাদের থাকিবার স্থান ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল। দঙ্গায় দৈঙ্গীয়াবা আমাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করিল। সেই বৎসব মহারাজা গঙ্গপুবে গিয়াছিলেন, আমরা গঙ্গপুবে আসিয়া তাঁহার দেখা পাইলাম। সেখানে বড়বড়িয়া আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেখানে গৌহাই তিনজনের এবং ফুকন ডাগির লোকেরা আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করিল। পরে মহারাজা রংপুবে আসিলেন এবং ত্রিপুরার দূতগণকে আনাইয়া ভটীয়া পাড়ায় বাসা করিয়া দেওয়াইলেন। পূর্বোক্ত লোকেরাই খাওয়ার যোগাড় করিতে লাগিল।

১৬৩৩ শকাব্দের আষাঢ় মাসে মহারাজার আদেশে সন্দিকাই বড়ফুকনের পুত্র বড়বড়িয়া ত্রিপুরার ছইজন দূতের জন্ত ছইটি জিন দিয়া সাজান ঘোড়া এবং আমাদের ছইজনের জন্ত ছইটি ঘোড়া মোট চারিটি ঘোড়া

দিয়া আনাইয়া ত্রিপুরার দূতগণকে জাঁক জমক কবিয়া অভ্যর্থনা কবিলেন। তখন বড়বড়ুয়া বলিলেন, “রামেশ্বর শ্রায়ালাস্কার ভট্ট চাৰ্য্য, উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, তোমরা যখন রওনা হও তখন তোমাদের রাজা রত্নমাণিকা কুশলে ছিলেন ত?” ত্রিপুরার দূতবৎ বলিলেন “স্বৰ্গদেব, আমরা যখন আসি তখন আমাদের মহারাজা কুশলে ছিলেন”। তখন বড়বড়ুয়া বলিলেন, “তোমাদের রাজাও তাঁহার রাজ্য কুশলে থাকুক ইহাই আমার কাম্য।” তারপর মজুমদার পত্রটি পাঠ কবিলেন। পত্রে গতে এই লেখা ছিল—

স্বস্তি সকল গুণচয়—সমুগোতিত কলেবর ননা দান-প্রমোদীকৃত-
মার্গাগণন-প্রতাপ তপন-বিগলিত রিপুণিকবানুকাব-শ্রীযুত-সুবত সিংহ বহুযা
বিমলশীলেষু । প্রেমসম্পাদকো লেখবৃত্তান্ত এষঃ । শ্রীবড়কন্দলী,
শ্রীঅৰ্জুন দাস প্রমুখ্যাং হৃদীয়াং সৰ্ববাস্তুত্ৰিষিদ্ধায় পরমানন্দযুতোহং ।
অতএব ভবদধিপনং সমীড়ে, পত্নী প্রহীযতে সভ্যা বাপ্তাবপি দৌ, কিম্বহ্ননা
তত্বক্ৰি বশতঃ সৰ্ব্বসিদ্ধাতব্যমিতি । যুগবামৰ্হু-শীতাং শুগণিতে শক বৎসবে ।
পঞ্চম্যাং ধবলে পক্ষে পক্ষে পত্নীচৈষা প্রহীযতে ॥ এই পত্র বড়বড়য়ার
নিকট লেখা হইয়াছিল ।

তখন বড়বড়ুয়া বলিলেন “বামেশ্বর গ্রামালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, উদয়নারায়ণ, রাজা রত্নমাণিক্যের পত্রে যাহা লেখা আছে তাহা শুনা গেল। রাজা মৌখিক কি বলিয়া দিয়াছেন তাহা বল।” ত্রিপুরার নৃতেরা বলিলেন “স্বর্গদেব, পত্রে যাহা লেখা আছে মুখেও তাহাই বলিয়া দিয়াছেন।” তারপর তাহাদিগকে খালায় করিয়া পান-সুপারি, কাঁসার বাটিতে চন্দন এবং খালায় করিয়া ফুলের মালা দিলেন। পরে বড়বড়ুয়া বলিলেন - “রামেশ্বর গ্রামালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, উদয়নারায়ণ, তোমরা বাসায় গিয়া বিশ্রাম কর। আমি তিনজন ডাক্তারীয়ার সঙ্গে আলোচনা করিয়া স্বর্গদেব মহারাজার চরণে নিবেদন করিব। যদি তোমাদের ভাগ্যে থাকে তবে মহারাজার চরণ দর্শন পাইতে পার।” তারপর ত্রিপুরার নৃতদিগকে তাহাদের বাসায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

পঞ্চম অধ্যায়

স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের সভায় ত্রিপুরার দূত

শ্রাবণ মাসের দশদিন থাকিতে মহারাজ ত্রিপুরার দূতগণকে অভ্যর্থনা করার আয়োজন করিলেন। সেই সময়ে রংপুরে মহারাজার সমস্ত দরগুলিই ইষ্টক নির্মিত ছিল। তারপর বড় ঘরের খুঁটি, তির ও ডাসায় মখমল, কির্মিজ, নরাকাপড়, রঘুনারিণি আতলক ইত্যাদি কাপড় দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ ঘরের তির, ঠাকুরা, চটা ইত্যাদিতে কৃষ্ণচূড়া বানাইয়া তাহাতে সোনার এবং রূপার গুলি ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। চালের চারিদিকে ঘেরিয়া তিনটি লাইন করিয়া পানের আকার করিয়া কাটিয়া ডিমের কুস্তমের রঙ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ঐগুলির গায়ে রূপার গুলি ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঘরের ভিতরে অষ্ট দিন মহারাজ যেখানে বসিতেন সেই দুই ভিটার মাঝখানে মাটি দিয়া ভিটা বাঁধিয়া মহারাজার বসিবার জায়গা করা হইয়াছিল। ঐ ভিটার উপরে পাটী পাতিয়া তাহার উপর বনাত পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ বনাতের উপরে সিংহাসন রাখা হইয়াছিল। ঐ ভিটার উপর চারিটি সোনার খুঁটি দিয়া উচা করিয়া একটি চান্দোয়া টানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। একটি জ্বালের মতন জ্বিনিঘের মধ্যে সোনা ও প্রবাল দিয়া গাঁথিয়া একটি বাতির আকারে বানাইয়া তাহাতে মূল্যবান পাথরের কাজ করিয়া এবং কিনারা গুলিতে গোলাকৃতি করিয়া চিহ্ন দিয়া সিংহাসনে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সিংহাসনের উপরে সাতখানা চান্দোয়া টানান হইয়াছিল। সিংহাসনের দুই ধারে অষ্টদিন মহারাজ যেখানে বসিতেন সেই ভিটার উপরে পাঁচখানি করিয়া চান্দোয়া টানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেদিন মহারাজ যেখানে বসিয়াছিলেন তাহার

সামনে তিনদিকে বনাত পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তীর ধনুকধারী, ঢালী, গাদাবন্দুকধারী এবং সহরবাসীদের আনাইয়াছিলেন। পিতলের ও রূপার দণ্ডধারী লোকদের এবং তীর ধনুকধারী, ঢালী, গাদাবন্দুকধারী, ষাধারী ও বড়শিধারী লোকদিগকে স্থানে স্থানে দাঁড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। হাতী ও ঘোড়া ডাইনে বামে দুইদিকে পিছু করিয়া রাখিয়াছিলেন। বড়ুয়া, ফুকন, রাজখোয়া, চমুয়াবড়ুয়া, হাজরকীয়া, দেওখাই, বাইলুঙ্গ, দেশী-বিদেশী পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ, কটকী, কাকতী এবং দৈবজ্ঞেরা পূর্ব নিয়মানুযায়ী যার যার জায়গায় বসিয়াছিলেন। সেইদিন এই সভা দেবসভার মতন দেখাইতেছিল।

তারপর ত্রিপুরাব দুই দূতের জন্ত দুইটি এবং আমাদের দুইজনের দুইটি মোট চারিটি জিন আটা ঘোড়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেই ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া আমরা রক্তনাথ গোস্বামীব বাড়িব পিছনের হাতীশালায় ত্রিপুরাব দূতগণকে রাখিলাম। তখন তিনজন গোঁহাই ধনুকধারী, বল্লমধাবী, দাধারী এবং হাতী ঘোড়া সঙ্গে করিয়া জাঁকজমকের সহিত সভায় আসিলেন। বড়ুয়া এবং ফুকনেরাও জাঁকজমকের সহিত আসিলেন। এইকপে সকলেই সভায় উপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজা বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া অন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন। দুইজন গোঁহাইদেব বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া মহারাজার সঙ্গে আসিয়া মহারাজার দুই ধারে বনাতের উপর বসিলেন। মহারাজার তামুলী পাঁচনী (পান সরবরাহকারী) মহারাজার পিছে নিয়মিত জায়গায় বসিল। অন্তরের স্ত্রীলোকেরাও তাহাদের নিয়মিত জায়গায় বসিলেন। তারপর গোঁহাইগণ আসিয়া তাহাদের নিয়মিত জায়গায় বসিলেন। তখন ত্রিপুরার দূতগণকে 'আনাইলে বড়ুয়ারের সন্মুখে যেখানে লোকজন বসিয়াছিল সেখান হইতে রামেশ্বর ছায়ালঙ্কার মাথায় ত্রিপুরা রাজার' পত্রটি 'লইয়া সাত জায়গায় আশীর্বাদ করিতে করিতে এবং উদয়নারায়ণ প্রার্থনা করিতে করিতে সভার ভিতরে প্রবেশ করিলেন,

পরে বসিবার জায়গায় আসিয়া রামেশ্বর ছায়ালঙ্কার আশীর্বাদ এবং উদয়নারায়ণ প্রণাম করিয়া বসিলেন। পাটীর উপরে সরা আনিয়া রাখা হইল। ত্রিপুরার দূতেরা উপঢৌকনগুলি তাহাতে রাখিলেন।

তারপর বড়বড়িয়া মহারাজাকে বলিলেন, “স্বর্গদেব ত্রিপুরার রাজা রত্নমাণিক্য স্বর্গদেবের প্রীতি কামনা করিয়া পত্র ও উপঢৌকন সহ দূত পাঠাইয়াছেন। ঐ দূতগণও মহারাজার চরণে প্রণাম জানাইতেছে।” তখন রাজমন্ত্রী বড়পাতর গোঁহাই বলিলেন, “রামেশ্বর ছায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে তোমরা যখন রওনা হও তখন রত্নমাণিক্য রাজা কুশলে ছিলেন ত ?” দূতগণ বলিলেন, “স্বর্গদেব, আমরা যখন রওনা হই তখন আমাদের মহারাজা কুশলে ছিলেন।” তারপর বড়পাতর বলিলেন, “রামেশ্বর ছায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজা বলিতেছেন যে রত্নমাণিক্য রাজা ও তাহার রাজ্য কুশলে থাকুক ইহাই স্বর্গ মহারাজের একান্ত কাম্য।” তখন মজুমদার আগাইয়া আসিলেন। ত্রিপুরার দূতের হাত হইতে পত্র লইয়া রত্নকন্দলী মজুমদারের হাতে দিলেন। মজুমদার সেই পত্র লইয়া কাথ-ভগুরী বড়য়ার হাতে দিলেন। তখন মহারাজার আদেশে কাথভগুরী বড়য়া সেই পত্র পাঠ করিলেন ত্রিপুরা রাজার পত্রে এইরূপ লেখা ছিল,—

স্বতি প্রবল বলাহকনিকায় প্রতীকাশ গগনস্থলাবিরল বিগলৈশ্চরয়ধারা
 পুরিতাখণ্ড ভূমণ্ডল দস্তাবল পটল সমুদয় প্রলয় প্রভঞ্জন প্রতিমজ্জবা,
 খর্ব্ব গর্ব্ব গন্ধর্ব্বগণ ক্ষুরক্ষুর ক্ষৌণীতলোচ্ছালিত ধূলিপটল মহোন্নতি
 পাটম সম্বন্ধিত মার্গণ্ডমণ্ডল তিরস্কার গরিম সমুচ্ছায়িত বিবিধ বৈজ্ঞান্যস্তী-
 চয়চাক্ৰ চেলাবলী বিচিত্র বিহায়ঃস্থল পাদতল সমুদ্ভাসিত চামীকর
 শতচক্র চর্ম্মনিচয়চমৎকার সম্ভাবিত ত্রিলোকীতল সম্বর্ধ সমরভ্রমভর
 নিজ্ঞান্বজ্জিনী নায়কগণ সমরবিজয় সমুত্তম সমীহ গোপুরনিঃসর বৃত্তান্তা-
 কলনভয় বিকলিতোজ্জিতালয় বিপ্রতীপ ভূপাল কুল রামালোচনানয়না-
 বলী বিশ্বলিতাঙ্কধারা সমুৎপাদিত পান্যপার পরিস্ফুর্জ প্রতাপোর্ব

বৈশ্বানর জ্বালা জ্বালাবলীড় ত্রিভুবন বিবর বিসরেখু। বিধিবোধিত কণককরি-
 তুরঙ্গ মাখনেকবিধ বিতরণ কৃতার্থী কৃতার্থিসার্থ গায়মান যশঃ প্রকাশীকৃত।
 শামঙলেষু শ্রীশ্রীযুত স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ মহারাজ পরম পবিত্র চরিত্রেষু।
 শ্রীশ্রীযুত রত্নমাণিক্য দেবশ্রুত সর্বিনয়নতিততি সম্পাদয়িত্রী পত্নী বিজ্ঞমতে।
 শ্রীআনন্দরাম বৈষ্ণব দ্বারা শ্রীসহচর ললিতামৃতমাদ্রিত মাকলয্য পরমা-
 প্যায়িতোহং, আবয়োরীশ্বরেণ কিন্নদত্তং তথাপি পত্র সন্দেশার্থমীষদ্বন্দ্ব প্রেয়তে
 শ্রীমদ্রবংপ্রনেধি দ্বারা স্বদীয় মঙ্গল প্রকাশ্যং শব্দভিনন্দকৈঃ শ্রীমদ্রাবদ-
 শৈবকর্যমানন্দ পাত্রী করিচ্ছামহে। অলমতি বিস্তরেণ গিরাম্, শ্রীরামেশ্বর
 শ্রীয়ালাঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুতোদয়ানারায়ণ বিশ্বাসে সর্বমাবেদয়িত্যতঃ।
 পক্ষাগ্নিরসমুদ্রাংগুগণিতে শকহায়ণে। গুর্চো পক্ষে সিতে পত্নী পঞ্চম্যাঃ
 প্রেমিতা শুভা ॥ যুধিষ্ঠিরশ্রুত সম্রাজো বিরাট দ্রোপদাবপি। দূরস্থৌ সময়ে
 তৌ চ সৌহার্দ্যদ্বিত্যে কারিণৌ ॥

এই পত্রের বিবরণ শুনিয়া মহারাজা সন্তুষ্ট হইলেন। তারপর বড়পাতর গোঁহাই বলিলেন—“রামেশ্বর শ্রীয়ালাঙ্কার ভট্টাচার্য্য, উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে রত্নমাণিক্য রাজার পত্রে যা লেখা আছে তাহা জানা গেল; বাচনিক কি বলিয়া দিয়াছেন তাহা বল।” ত্রিপুরার দূতগণ বলিলেন “স্বর্গদেব, মহারাজার শ্রুণ ও চরিত্রের কথা শুনিয়া মহারাজার সঙ্গে প্রীতি সংস্থাপনের বাসনা করিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।” তারপর বড়পাতর বলিলেন, “রামেশ্বর শ্রীয়ালাঙ্কার ভট্টাচার্য্য, উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজা বলিতেছেন তোমরা বাসায় গিয়া বিশ্রাম কর। রত্নমাণিক্য রাজা যে প্রীতির বাসনা করিয়াছেন প্রীতি পথে থাকিলে আমাদের মধ্যে তাহা না হইবার কোনও কারণ নাই।” তারপর রামেশ্বর শ্রীয়ালাঙ্কার মহারাজাকে আশীর্ব্বাদ ও উদয়নারায়ণ প্রণাম করিলেন। এইরূপে আশীর্ব্বাদ ও প্রণাম করিয়া ত্রিপুরার দূতগণ নিজেদের বাসায় গেলেন।

ত্রিপুরার দূতগণ সন্তোষিত হইতে চলিয়া গেলে পর মহারাজা দেশী ও

বিদেশী পণ্ডিত দ্বারা ঐ পত্রের অর্থ করাইলেন। তারপর মহারাজা অন্তরে গেলেন। ত্রিপুরার রাজা স্বর্গদেব মহারাজের জন্ত যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহার ফিরিস্তি—হীরা ও পাথরখচিত কলকা একটি, দুগ্‌দুগী একটি, বিলোলের তৈরী বাটের পাথর খচিত খঞ্জর একটি, গুজরাটী সোনালী রংয়ের তসরের কাপড় একটি, সোনালী রংয়ের বাদামী কাপড় একটি, কিংখাব কাপড় দুইটি, গুজরাটী সোনালী কাজ করা জিরা দুইটি, গুজরাটী সোনালী পটুকা দুইটি, বন্দরী ডিট কাপড় দুইটি, উৎকৃষ্ট চিকন টুকরা কাপড় দুইখানা, চিকন ছাতান কাপড় দুই খণ্ড এবং চিকন সাদা পাগড়ি দুইটি।

ত্রিপুরার রাজা বড়বড়য়ার জন্ত যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহার ফিরিস্তি—পাথর খচিত দুগ্‌দুগী একটি, গুজরাটী সোনালী কাজ করা জিরা একটি, সোনালী পটুকা একটি এবং কিংখাব একটি।

পরদিন হইতে স্বর্গদেবের আদেশে ত্রিপুরার দূতগণকে বড় ভাণ্ডার হইতে মাসিক হিসাবে প্রতিদিন পূর্বের চারিগুণ করিয়া বৃদ্ধি করিয়া থাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। তাবপর মহারাজ দুর্গা পূজার মাস আশ্বিন মাসের ১৫ই তারিখে পূর্বের ন্যায় সভা করিয়া সভায় ত্রিপুরার দূত রামেশ্বর শ্রায়ালঙ্কার ও উদয়নারায়ণকে আনাইলেন। তাহারাও পূর্বের ন্যায় আশীর্ব্বাদ ও প্রণাম করিয়া বড়ঘরের বিশিষ্ট জায়গায় বসিলেন। তখন স্বর্গ মহারাজের আদেশে বড়পাতর গোঁহাই বলিলেন, “রামেশ্বর শ্রায়ালঙ্কার ভট্টচার্য্য, উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজ বলিতেছেন যে তিনি আজ তোমাদিগকে বিদায় দিলেন। রত্নমাণিক্য রাজা পত্রে যে কথা লিখিয়াছেন তাহার উত্তর তাহার নামীয় পত্রে দেওয়া আছে। তোমারা মুখেও বলিও যে রত্নমাণিক্য রাজার সঙ্গে আমাদের অখণ্ড শ্রীতি সংস্থাপিত হইল। এই শ্রীতি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে ত্রিপুরার রাজাও যেন সেই বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন।” তারপর ত্রিপুরার দূতগণ বলিলেন, “ভগবতী যেন এইরূপই করেন।” এই কথা বলিয়া রামেশ্বর শ্রায়ালঙ্কার এই শ্লোকটি বলিলেন,—

বন্ধনাশ্রুপি বহুনি, সস্তি চেতঃ প্রেমরজ্জু বিনিবন্ধন মগ্নং ।

কার্ত্তভেদ নিপুণোহি ষড়্ভির্লিঙ্গিয়ো ভবতি পঞ্চজবন্ধঃ ॥

তারপর বড়পাতর গোঁহাই বলিলেন, “রামেশ্বর ঞ্চায়াসঙ্কার ভূঁচাৰ্চ্য, উদয়নাঙ্কয়ণ বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজা বলিতেছেন যে তোমরা আজ বাসায় গিয়া বিশ্রাম কর, অষ্ট দিন নিজ দেশে যাইও ।” এই বলিয়া দূতদ্বিগকে তাহাদের বাসায় পাঠাইয়া দিলেন । মহারাজ ও অন্তরে গেলেন ।

স্বর্গদেব ত্রিপুরার রাজাকে যে পত্র লিখিলেন তাহা এই :— স্বস্তি
বারিবাহ প্রতীমানুপমকরাজস্র কেশরিগণ্ডল শ্মৈরেয়ধার পঙ্কিল মহীমণ্ডল
মত্ত মাতঙ্গ দশন দারিত সমুচ্ছলদপারকুপার তরঙ্গ বলদোর্দিগুথগু কোদণ্ড
নিঃসরচ্চণ্ড কাণ্ডখণ্ডখণ্ডীকতারি মোক্তিকাস্ত্র গত্যাৱ সতাব তিরস্কৃত বাত
তুঙ্গ তুরঙ্গখুরক্ষোদন ধূলি ধূসরতাচ্ছাদিত তুহিনকরাকারাক্ষুশ সপ্তবিবরভিত্তর
ব্রহ্মানস্ত্র নিতাস্ত্র বিদ্রাবিতাসিততি বিদ্বাস্ত্রিবৈরিবামলোচনা লোচনানবরত
পতিতাস্র সস্ত্রাবিত গগণরণচরবিসদ পলাশ বারিদতারকাচকোর-
কালীকলতকীর্ত্তি ব্রততীকুস্ত্রম কুমুদিনী কাস্ত্র কমনীয়কপালিক পাল তুলাৱচি
পরিণত প্রতাপ তপন তাপিতামিতাশাস্ত্র বিনিকায নিরবধি মনি তেমাদি
বিতরণ পূৱিত বিশ্বস্ত্রাস্ত্রাথিচয় শ্রীশ্রীযুত রত্নমাণিকা দেব রাজবর
শ্রীমদিগরীন্দ্র নন্দিনী পদস্থধাংস্ত্র চন্দ্রিকা পিপৎস্বচেতঃ চকোৱেষু ।
স্বকীয় স্বস্ত্রস্থাবেদিকেয় পত্নী নিতরাং বরীবরীতিস্র শ্রীমতামতিশয়িত
শিবতমমমুঘস্রমাসাম্বেতরাং অস্রদাকলিত বিষয়বৃন্দেষু শ্রেয়সমবেব্যত
যুৎ প্রেমা ভবাদৃশ প্রাপিতাপসর্প সমপিত পত্ন্যা বয়ং যাদৃশ শাতপাত্র্য-
ক্রিয়ামহে তদধিগময়িতুং গীৰ্ব্বাণগুরোর্গীৱপ্যাং সমাগত পত্ন্যাবয়োঃ
সাল্প্রমোদোহজ্জনি শ্রীমন্ত্রবাদৃশান্ স্বানুরূপতয়োরীকৃৎসঃ এতদবধি যথা
পরম্পর প্রাণিষী সর্পণাপসর্পণে সন্ধিধায়োভয়স্রাস্ত্র-মাহলাদয়িয্যত তত্র
বয়মানন্দপাত্নী করিষ্যামহে মৎপ্রাণস্থাপিতাপসর্প শ্রীৱত্নকন্দলী শর্ম্মার্জুনদাসৌ
সর্ব্বমাবেদয়িষ্যতঃ ক্ষেমাখ্যাগ্নিকা পত্নী সন্দধতি কিয়চ্চ স্বকীয়হেনোরীকৃত্যা-
লঙ্করণীয়েতি কৃতং পল্লবিতেন । উভয়োস্তুল্য সন্ধে হুযোধন কিরীটিনোঃ ।

ধনঞ্জয়মগাং কৃষ্ণঃ প্রীতিরবাস্থিধা ভবেং । পীযুষস্তন্দিভান্দ্ৰমনিবৃত্ত
জনিন্ধাস নেত্রাক্ষমূত্র ক্রৌঞ্চ প্রাণাপহস্তানন রজনী মনি প্রাপ্ত সঙ্কেত শাকে ।
নিঘূর্ত্যার্য্যম্নি ঘশংকতিচিদিযুতি থাবুর্জ্জমাসেহমলাগো পক্ষে সন্দেশবাচাং
প্রকটিত বিতরা পত্রিকেষং বালেখি । ১৬৩৩ মাস কাষ্ঠিক শুক্লপক্ষ
পঞ্চমী তিথি ।

স্বর্গদেব ত্রিপুরার রাজা রত্নমাণিক্যের জ্ঞাত যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন
তাহার ফিরিস্তি :—সোনার কাজ করা চাকু চারিটি, বপাব কাজকরা চাকু
চারিটি, ধপদানী দুইটি, পকড়া খজা চারিটি, শুক চামর চাবিটি, কৃষ্ণ
চামর চারিটি এবং হাতীৰ দাঁতের তৈয়ারী গা আচর। একখানা ।

এক ভিন্ন পত্রে লেখা ছিল :—রত্নিন গুটী দেওয়া নরা কাপড়
একটি, নরা কাপড় সাদা একটি, নরা কাপড় সবুজ রংয়ের একটি, লাল রং
একমন চারি সেব, ফুলতোলা আতলপ একটি, সবুজ রংয়ের আতলপ একটি,
লাল ও সাদা রংয়ের আতলপ একটি, সাদা ব এবং কাল রং একমন,
সোনালী ওড়না দুইটি, নোনালী পাগাড় দুইটি, সোনালী পটুকা দুইটি,
সোনালী জামার কাপড় একখানা, কাল রংয়ের বড় বড় ফুল দেওয়া বড়
কাপড় একটি, লালফুল দেওয়া বড় কাপড় একটি, দশ হাত লম্বা চিকন টুকরা
কাপড় চৌদ্দ খানা, চিকন সিয়া মশারি একটি, সোনার পাথর খচিত কোটা
একটি, কলগা একটি, ছগ্ ছগী একটি, কর্ণফুল একজোড়া, সোনার ফুল বসান
ডগ্ ডগী একটি, ত্রিপুরার রাজার জ্ঞাত এই সমস্ত উপঢৌকন দেওয়া হইল ।
ত্রিপুরা রাজার নিকট কদ্রসিংহের গোপনীয় পত্রটিতে এইকপ লেখা ছিল—

স্বস্তি নিস্তুল নিরস্তুরামিত দান মান সম্ভান মানিতানেক নিবৃত্তস্থ
জনগণ গীয়মান যশোরাকাহিমকর ধবলীকৃতাস্বর নিরস্তরকোশ করবীর
মন্তমাতঙ্গ নিকায় প্রেতিম বিপক্ষ বহুবিদ্রাবনজ্জয়বীর মহিলানয়ন নির্গচ্ছদম্ব
নিকর প্রেতাপ তপন তাপ তিরোভূত তিমিরততি স্বজন পদ চতুষ্পদীকৃত
বর্ষ ধূম্রাবতার জনি পবিত্রীকৃত বিশ্বস্তর শ্রী.শ্রীযুত রত্ন মাণিক্যদেব
রাজবরেণু লেখনম্ । রহস্য পত্রমিদং—

সমাচার এই যে জনশ্রুতিতে জানা যায় যে মোগলের বিরুদ্ধ আচরণে বেদান্ত ধর্মরক্ষা পাইতেছে না। এইজন্য যদি উহার প্রতিকারের জন্য আপনার ইচ্ছা থাকে তবে আপনার সঙ্গে যে যে বড়লোকের সহায়তা আছে তাহাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাহাদের সামর্থ ও শক্তির বিবরণ বিশদভাবে আমার নিকটে লিখিবেন। সমস্ত লোকই ঈশ্বরের অধীন তথাপি নিজের দেশে অপরে যাহাতে বিনা পরাজয়ে অগ্নায় কাজ না করিতে পারে এবং যাহাতে নিজেই ঐ কার্যের বাধা দিতে পারা যায় তজ্জন্য সচেতন থাকিবেন। বাকি সমাচার শ্রীকৃষ্ণদেবগী ও অর্জুন দাসের মুখে অবগত হইবেন। অধিক আর বলিবার প্রয়োজন কি, ইতি। শকাব্দ ১৬৩৩, মাস কাটিক, তারিখ ৫। ত্রিপুরা রাজার জন্ম স্বর্গদেবের এই পত্রটি গোপনে একটি চুঙ্গার মধ্যে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ত্রিপুরার দূতগণের বিদায় গ্রহণ

তারপর ত্রিপুরা রাজার দূতগণকে বিদায় দেওয়ার জন্য পূর্বের স্থায় সম্মতি করিয়া বড়বড়িয়া দূতগণকে তথায় আনাইলেন। তাহারা পূর্বের মত আসিয়া বড়বড়িয়ার ঘরে বসিলেন। তারপর বড়বড়িয়া বলিলেন—“রামেশ্বর ক্রমাঙ্কিত্যর ভট্টাচার্য্য, উদয়নারায়ণ বিদ্যাল, স্বর্গদেব রাজা তোমাদিগকে বিদায় দিয়াছেন, অজ্ঞ আমিও তোমাদিগকে বিদায় দিলাম। রাজার রক্ষাদিগের পত্রে যে সর কথা লেখা আছে তাহার উক্ত রক্ষাদিগের পত্রে দেওয়া হইয়াছে। মুখেও তোমরা বলিও যে স্বর্গদেব রাজার

সঙ্গে রাজা রত্নমাণিক্যের যে প্রীতির বন্ধনটি হইয়াছে তাহা যেন হ্রাস না হয় এবং তিনিও যেন তদ্রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।” আরও বলিলেন যে, —“বড়লোকেব ভালবাসা অন্তবের আর সাধারণ লোকের ভালবাসা বাক্যদ্বারা হয়। যাহাতে একমনে এই প্রীতির বন্ধনটি রক্ষা হয় তোমরা সেইকপ করিও।” সেই সময়ে দূতগণ বলিলেন,—

“স্বর্গদেব, ইন্দ্রবী যেন এইকপই কবেন।”

বড়বুয়া বলিলেন, “বামেগব চায়ালঙ্কার, উদয়নাবাগণ বিশ্বাস, অনেকদিন হইল তোমরা আসিয়াছ। স্বর্গ মহারাজ শিকাব করিবার জন্ত এবং কৌতুক আনন্দ করিবার জন্ত গিয়াছিলেন, আমিও সময়মত তাঁহাকে তোমাদের বথা জানাইতে পারি নাই। পরে তোমরা বলিলে যে বধাকালে তোমরা যাইতে পারিবে না। এইকপে তোমাদের যাইতে বিলম্ব হইয়া গেল। এখন স্বর্গ মহারাজ উপঢৌকন ও পত্র দিয়া ত্রিপুরায় দূত পাঠাইয়াছেন। আমি ঐ দূতগণকে শীঘ্রই বিদায় দিতেছি।” তখন ত্রিপুরার দুইরা বলিলেন,—“স্বর্গদেব, বলিবার দাযঃ আমাদের, আপনি যেকপ বলিলেন আমরা সেইকপই বলিব।” তারপর পূর্বের স্তায় দূতগণকে ফুল চন্দন, পান-মুপারি দেওয়াইলেন। তখন বড়বুয়া বলিলেন,—“রামেশ্বর স্তায়ালঙ্কার, উদয়নাবাগণ বিশ্বাস, এখন তোমরা বাসায় গিয়া বিশ্রাম কর, অগ্ন্যদিন নিজ দেশে রহনা হইও।” তারপর অপর দিনের স্তায় দূতগণ বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

বড়বুয়া ত্রিপুরার রাজার নিকটে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহা এই—স্বস্তি রত্নাকর তরঙ্গরঙ্গ তুঙ্গ তুরঙ্গখুর ক্ষোদন দন্তর ধরামণ্ডলোৎথরঙ্কো রাজ্যমানাস্বরপূরণ বারিবাহনিকায় প্রতিম মন্ত্রমাতঙ্গমদোদাল মঙ্গলমুখরতান-বরত ক্ষরমৈরায়খারা প্রবীকৃত দিগন্তরাল প্রতিষন্ত্র বিধিয়মান মণি হেমাদি-দান সন্তান সন্তাপিতাগণননিবুদ্ধ সজ্জনগণ গীয়মান শরদিন্দু স্তম্ভর যশস্তিরস্কৃত রাধেয়াদিবদাশ্রয়ক চিরসমিত কীর্তি প্রারক শ্রীশ্রীযুত রত্নমাণিক্য দেব রাজবরেন্দ্র। সগৌরবপূর্বক লেখনঃ দিগ্ভাষনক। প্রথমে লিখি দে

শ্রীযুতের পরম উন্নতি সর্বদা কামনা কবিয়া এই বুশল পত্র দিতেছে। দ্বিতীয় এই যে শ্রীযুত রূপা পূর্বক যে পত্র দিয়াছেন তাহার পাঠ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ইচ্ছা কবি এইরূপ পত্র ব্যবহার সর্বদা হইতে থাকে এবং স্বর্গদেব মহারাজাব সহিত শ্রীযুতের প্রীতি বাড়িতে থাকে। বাকি সমাচার আমাদের দূত শ্রীমুকন্দলী শর্মা ও শ্রীঅর্জুন দাস সাফাতেব গোচরে আনিবে। অধিক কি লিখিব, ইত্যাদি। শব্দ ১৬৩৩, মাস কার্তিক, তারিখ ৫। এই পত্রখানা বড়ডুয়া গ্রামে বাক্যকে দেওয়াব জন্ত দিলেন। ত্রিপুরা রাজার জন্ত বড়ডুয়া যে উপাধিকন দিয়াছিলেন তাহার কিরিস্তি—সোনার বড় কোটা একটি এবং নব কপড় দুইটি।

ত্রিপুরা রাজার দূতগণকে স্বর্গদেব যে পুরস্কার দিলেন তাহার কিরিস্তি কাঠি দেওয়া সোনার কর্ণফুল দুই জোড়া, চাবি নাগের চাবি দুই জোড়া, চিকন আতলকের জামা দুইটি, সোনালী পাগড়ি দুইটি, কপালী চেল দুইটি, সোনালী পটুকা দুইটি, ঢেঁকেবী ভূনি দুইটি এবং টাকা ৪০০। রামেশ্বর ঝায়ালাকারকে সোনা ১২ তোলা এবং উদয়নাবাষণকে সোনা ১৮ তোলা দিলেন। যতুনন্দন বৈজকে দিলেন সোনার গুচ্ছ দেওয়া কান ফুল এক জোড়া, দুই ভাঁজকরা ফুল তোলা বড় কাপড় একটি, রঙ্গিন পাগড়ি একটি, সূতী জামা একটি, পাট কাপড় একটি, মজা ভূনি একটি, সোনা দশ তোলা, টাকা ১৮০। দৈত্য সিংহ, গোবিন্দা ছেঁকিবাই, নাপিত বৈকুণ্ঠ এবং শঙ্কর এই চাবিজনকে দিলেন সোনার অস্ত্রী চারি জোড়া, বড় কাপড় চারিটি, সূতী জামা চারিটি, রঙ্গিন পাগড়ি চারিটি পটুকা চারিটি এবং মজা ভূনি চারটি। দুইজন দৈত্য সিংহকে দিলেন রূপা ১৬০ তোলা এবং দুইজন নাপিতকে দিলেন ১১০ টাকা, ত্রিপুরার দূতগণের সঙ্গে চারিজন চাকরকে দিলেন—বড় কাপড় চারিটি, বড় ভূনি চারিটি, পাগড়ি চারিটি এবং ৯২ টাকা।

বড়বড়ুয়া ত্রিপুরার দূতগণকে যে পুরস্কার দিলেন তাহার কিরিস্তি—সূতী চিকন কাপড়ের জামা দুইটি, চিকন পাগড়ি দুইটি, পটুকা দুইটি, বড়

ফুল দেওয়া বড় কাপড় দুইটি, ভুনি দুইটি এবং অস্ত্রী দুইটি। রামেশ্বর ছায়া-লঙ্কাবকে দিলেন ৪৫ টাকা এবং উদয়নাবায়ণকে দিলেন ৩৫ টাকা, দুইজন দৈত্য সিংহকে ৮ টাকা এবং দুইজন নাপিতকে দিলেন ৬ টাকা। যত্নন্দন বৈঠকে দিলেন ৬ টাকা এবং চারিজন চাকরের জুতা দিলেন মোট ৮ টাকা। এইকপে পূবস্কাব দিয়া বড়বড়ুয়া ত্রিপুরার দূতগণকে পাঠাইতে মনস্ত্রি কবিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ত্রিপুরার দূতগণকে পাঠাইবাব সম্পর্কে ত্রিপুরা বাজাব সঙ্গে কে কে কথা-বার্তা বলিয়া তাহাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন।” আমবা বলিলাম “ত্রিপুরা রাজার ভাই দনশ্যাম ঠাকুর এবং কবি পণ্ডিত নাবাগ মিলিয়া বাজাব সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া তাহাদের দূত পাঠাইয়াছেন। তখন বড়বড়ুয়া ঘনশ্যাম ঠাকুরের জন্ত সোনা ৮ তোলা এবং একটি নবা কাপড় এবং কবি পণ্ডিত নারায়ণের জন্ত সোনা ৪ তোলা দিলেন। পবে আমাদের দূতবা অর্থাৎ আমবা ঘনশ্যাম ঠাকুর বাজা হইলে পব এই ৮ তোলা সোনা ও নবা কাপড়খানা তাহাকে দিয়া সাংক্ষাৎ কবিয়াছিলাম।

সপ্তম অধ্যায়

ত্রিপুরার দূতগণের দুর্গোৎসব দর্শন

ত্রিপুরার দূতগণের বিদায় দেওয়া হইয়া গেলে পর দুর্গোৎসবের কাল আসিল। তখন মহারাজ বড়বড়ুয়াকে দিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে “তাহারা সেখানের দুর্গাপূজা দেখিতে ইচ্ছা করে কিনা। তাহা স্বাভাৱ, বিষ্ণু ও শিবের মূর্তি আছে, সেই স্থান তাহারা দেখিতে চায় কিনা।” এই

কথা শুনিয়া ত্রিপুরার দূতগণ বলিলেন, “বড়বড়ুয়া নবাবের অনুগ্রহে যদি আমরা ঈশ্বর দর্শন করিতে পাই; ঠাকুরাণী দর্শন করিতে পাই তবে আমাদের পরম ভাগ্য বলিতে হইবে।” দূতগণ এইরূপ বলিলে অষ্টমীত্বে দিনে তাহাদিগকে আনিতে আদেশ হইল। সেইদিন আমাদের দূতেরা ত্রিপুরার দূতগণকে আনিয়া বড়মন্দিরে প্রণাম করাইল। পরে সূর্য্য, গণেশ ও নারায়ণ এই তিন দেবতার মন্দিরে তাহাদিগকে প্রণাম করাইল। মহাদেবের মন্দিরে আসিয়া মহাদেবকে প্রণাম করাইল এবং নরসিংহ গোসাঁইকেও প্রণাম করাইল। তারপর তুর্গাদেবীর ঘরের দিকে আনিয়া তুর্গাদেবীকে প্রণাম করাইল। পত্রিকাঘরে আনিয়া মহামায়া দেবীকে প্রণাম করাইল। সেই সময়ে মহারাজ তুর্গাপূজার জায়গায় গিয়া তুর্গাদেবীকে প্রণাম কবিয়া আসিয়া নাট-মন্দিরের বিশিষ্ট স্থানে বসিলেন। মহারাজ যাওয়ার সময়ে ত্রিপুরার দূতগণকে আড়াল করিয়া রাখা হইল। তারপর মহারাজ বসিলে পর তাহাদিগকে পত্রিকাঘরের সম্মুখের ঘরটিতে বসান হইল।

মহারাজের সম্মুখে দেশী-বিদেশী গুণীগণ গান করিতেছিলেন। দেশী-বিদেশী পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ মহারাজের দেওয়া পুরস্কারের জিনিসপত্র পরিধান করিয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সভায় বসিলেন। তারপর মহারাজ বড়বড়ুয়ার মারফত রত্নকন্দলীকে ত্রিপুরার দূতগণের নিকট পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “মহারাজের অভিপ্রায় আমাদের এ জায়গার পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সঙ্গে রামেশ্বর ছায়া অলঙ্কারের বিচার হউক, রামেশ্বরই বা এ বিষয়ে কি বলে?” তখন রামেশ্বর ছায়ালালঙ্কার বলিলেন, “মহারাজের এই সভা সাক্ষাৎ ইন্দের সভা, এই সভার পণ্ডিত বৃহস্পতি, এই সভায় বাক্যুদ্ধ করিবার যোগ্যতা আমার নাই, তথাপি মহারাজের যখন আদেশ হইয়াছে, আমি যাহা জানি পরীক্ষা দিব।” মহারাজকে এই কথা জানাইলে মহারাজ কতক্ষণ থাকিয়া উঠিলেন। পরে এক সময়ে মহারাজ দেশী-বিদেশী পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে আনাইলেন, ত্রিপুরার ঐ ছইজন দূতদিগকেও আনাইলেন এবং জয়গোপালের সঙ্গে রামেশ্বর ছায়ালালঙ্কারের তর্কযুদ্ধ করাইলেন।

তারপর মহারাজ নিজেই বলিলেন,—“রামেশ্বর ছায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য দূত হিসাবে এখানে আসিয়াছে, পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ হিসাবে নয়। যদি পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ হিসাবে এখানে আসিত তবেই শুধু একপ তর্কযুদ্ধ হওয়া উচিত। এখন একটু আমোদ করা গেল মাত্র।” এই কথা বলিয়া মহারাজ উঠিয়া আসিলেন এবং ত্রিপুরার দূতগণকে তাহাদের বাসায় লইয়া যাওয়া হইল। তারপর আমাদের দুইজন দূতকে মহারাজ পুরস্কার দিলেন, যথা--কাটি দেওয়া সোনার কর্ণফুল, আতলঞ্চের জামা, রুপালী পটুকা, সোনালী বড় পাগড়ি, ঢেঁকেরী ভূনি, দুই ভাজকরা ফুলতোলা বড় কাপড় এবং ৪০ টাকা। আমাদের সঙ্গে ত্রিপুরায় যাইবার জন্ত গোঁহাইদের লোক মোট ৩৪ জন দেওয়া হইল, তন্মধ্যে রত্নকন্দলীর সঙ্গে ১৮ জন এবং অর্জুনের সঙ্গে ১৬ জন যাওয়া স্থির হইল। এই লোকদিগকে জনপ্রতি ৩ টাকা করিয়া দেওয়া হইল।

অষ্টম অধ্যায়

ত্রিপুরায় যাওয়ার পথে যেখানে যাহা আছে তাহার বিবরণ

কার্তিক মাসের তিন দিন থাকিতে এক সোমবারে ত্রিপুরার দূতগণের সহিত আমরা ত্রিপুরা দেশ অভিমুখে রওনা হইলাম। আমাদের ভট্টায়া-পাড়ায় বাসা হইতে নামডাঙ্গায় গিয়া নৌকায় উঠিয়া আমরা সাতদিনে রহায় পৌঁছিলাম। সেখানে তিন দিন থাকিয়া পুনঃ সেখান হইতে রওনা হইয়া পাঁচ দিনে ডেমেরায় আসিলাম। এখানে আসিয়া আমরা নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। ডেমেরায় একদিন থাকিয়া পূর্নরায় রওনা হইয়া এগার

দিনে খাছপুরে পৌঁছিসাম। সেখানে কাছাড়ী রাজা আমাদিগের থাকিবার স্থান ও খাওয়ার জিনিষপত্র দিলেন। কাছাড়ী রাজা ত্রিপুরার দূতগণকে দরবারে সংবর্ধনা করিলেন এবং পরে বিদায় দিলেন; কিন্তু ত্রিপুরা রাজার জ্যেষ্ঠ পত্র বা উপঢৌকন কিছুই দিলেন না। ত্রিপুরার দুইজন দূতকে কাশাস স্ততার দোপটা কাপড় দুইখানি এবং পাগড়ি দুইটি দিলেন। খাছপুরে উনিশ দিন থাকিবার পর বড়বুয়ার একজন পেয়াদা সঙ্গে দিয়া আমাদের সঙ্গে যে সলালের লোক গিয়াছিল তাহাদিগকে ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কাছাড়ী রাজা আমাদের সঙ্গে নৌকা ও লোক দিলেন এবং পেয়াদাও একজন দিলেন। বড়বুয়ার পেয়াদা একজন এবং রহার চকীয়াল বড়া একজন—এই দুইজন আমাদের সঙ্গে চলিল। খাছপুর হইতে অনুমান ছয় দণ্ড কালের পথ গিয়া উদারবনে নথুরা নদীতে নৌকায় উঠিয়া সেই দিনেই আমরা বরাক নদীতে পড়িলাম। এই জায়গা হইতে বরাক নদী দিয়া উজাইয়া গিয়া চারদিনে লক্ষ্মাপুরে পৌঁছিলাম।

সেই জায়গায় দুইদিন থাকিয়া সেখান হইতে রওনা হইয়া পাঁচদিনে কাছার ও ত্রিপুরার সীমানা রূপিনী নদীর মুখ পাইলাম। সেখানে কোনও লোক বাস করে না। সেখানে নদীর দুই ধারে পর্বত। রূপিনী নদীর মুখ হইতে তিন দিনে আসিয়া ত্রিপুরা রাজার অধীনস্থ রাংরুং এ উপস্থিত হইলাম। সেখানে বরাক নদীর দুই ধারে পর্বত আছে। সেই পর্বতে আমাদের দেশের নাগা, ডফলাদের মত লোকেরা বাস করে; তাহাদিগকে লোকে কুকি বলে। সেখানে অনুমান তিনশত লোক আছে। তাহাদের অস্ত্র তীর, ধনুক, ঢাল এবং নাগা যাঠি। তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব দিয়া ত্রিপুরার রাজা তাহাদেরই একজনকে সর্দার করিয়া দিয়াছেন; এই সর্দারকে লোকে হালামছা বলে। আমাদের দেশের নাগাদের মধ্যে খুনবাউ নাগারা যেমন ঠিক সেই প্রকার। ঐ হালামছার অধীনে গালিম একজন, গাবোর একজন, ছাপিয়া একজন এবং দলৈ একজন থাকে। তাহাদের খাওয়া পরা নাগাদের মতন; তাহারা গরু খায় না। সেই জায়গায় ত্রিপুরা

রাজার একজন লস্কব থাকে ; তাহাকে ত্রিপুরা রাজার তরফ হইতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই লস্কবের মাঝে মাঝে বদলী হয়। এই স্থানে পাওয়া যায়—গবয়, হাতীব দাঁত, গোলমরিচ, সুপারি, পান, ধান, কাণ্ডন, তরমুজ, কুমড়া, কচু, আদা, ঘুটি, কলা, বেগুন এবং তুলা। এখানে কাছাড়ী ও মেখলী দেশের লোক আসিয়া জিনিসপত্র কেনা বেচা করে। কাছাড়ী লোকেণা আনে—ডগল হাঁস, মুবগী, গুটকী, চাউল, লবণ, তৈল, গুড়, তামাক পাতা ও ওবনা সুপারি। মেখলী দেশ হইতে আসে—সোনা, কাঁসার থালা, কলস ও খেস্ কাপড়, বাজাকে দেওয়ার জন্ত মেখলীরা যত্ন করিয়া ঘোড়া ও আনে। ত্রিপুরা দেশ হইতে আসে—পিতল, তাম্র, তৈল, গুড়, তামাক-পাতা, শুকনা সুপারি এবং গুটকী। রাজ্য এ এই সমস্ত জিনিস আনিয়া লোকেণা কেনা বেচা করে। বাংকঙ্গীষাদের ত্রিপুরা রাজাকে প্রতি বৎসর দিতে হয়—সে ডা একটি, সোনা, হাতীব দাঁত, থালা, গোলমরিচ, খেস্ কাপড়, কার্পাস এবং গবয়। বেচা কেনা করিব জন্ত কাছাড়ী রাজাকে প্রতি বৎসর দিতে হয়—গবয় একটি।

সেখান হইতে মেখলী দেশের সীমানা ছই প্রহরের রাস্তা মাত্র দূরে। এই পথে আইনুগ পর্বত পড়ে ; সেখানে মেখলী জাতির লোকেরা বাস করে। আমবা ক এ আসিয়া চুড়ামণি বুড়ার দেখা পাইলাম। চুড়ামণিকে ত্রিপুরার রাজা পূর্বেই সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে আসিয়া বরাক নদীর পাড়ে আমাদের জন্ত একটি ঘর বানাইয়া উহা সাজাইয়া রাখিয়াছিল। চুড়ামণির সঙ্গে বা কং এর লোকেরা আসিয়া একত্র হইল। তাহারা আমাদের থাকিবাব স্থান ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। সেখান হইতে কাছাড়ী রাজার নৌকা ও লোকজন ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বড়বুড়ার পেয়াদা ও চকীয়ালবড়াকেও ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেখানে আমরা এগার দিন রহিলাম। সেখানের লোকেরা আমাদের বোঝা বহিবার জন্ত লোক দিল। ত্রিপুরার দূতগণকে এবং আমাদের ছইজনকে মাচায় তুলিয়া বহিয়া লইয়া যাইবার জন্ত লোক দিল।

সর্বমোট তাহারা আমাদিগকে একশত চল্লিশজন লোক দিয়াছিল। সেখান হইতে রওনা হইয়া আমরা চার দিনে রূপিনী পাড়ায় পৌঁছিলাম। রূপিনী পাড়া হইতে রাংরুঙ্গীয়াদের লোক ফিরিয়া আসিল। এবার এখানের লোকেরা আমাদের মালপত্র বহিয়া লইয়া আমাদের সঙ্গে চলিল। তাহারা আমাদের খাওয়া ও থাকার বন্দোবস্তও কবিয়া দিল। এই জায়গার লোকেরা রাংরুঙ্গীয়াদের মতন কুকি বটে। —এই জায়গার লোকদের উপর ক্ষমতা দিয়া ত্রিপুরার রাজা একজন ত্রিপুর কে সর্দার করিয়া বসাইয়াছেন, লোকে তাহাকে মুনশী বলে।

রাংরুং হইতে ত্রিপুরা রাজার রাজধানী পর্য্যন্ত পর্বত রহিয়াছে। এই পর্বতে লোকদের বাড়িতে রাংরুঙ্গীয়াদের মতন সকল দ্রবাই জন্মে কিন্তু পান হুপারি জন্মে না। রূপিনী পাড়ায় আমরা বার দিন বাস করিলাম। সেখানে তৈজলপাড়া নামে একটি জায়গা আছে; সেখানের লোকেরা আসিয়া এখানের লোকদেব সঙ্গে একত্র হইয়া আমাদিগকে পূর্বের মতন লইয়া চলিল। রূপিনী পাড়া হইতে আমরা চার দিনে ছারঠাং নদীর পাড়ে পৌঁছিলাম; সেখানে কুম্জাং নামে একটি পাড়া আছে, এবার সেই পাড়ার লোকেরা আসিয়া আমাদিগকে লইয়া চলিল এবং তৈজল পাড়ার লোকেরা ফিরিয়া গেল। ছারঠাং নদীর পর হইতে দক্ষিণ দিকে আর নির্দিষ্ট দখলকারী হইয়া থাকা লোক নাই, সাধারণ গ্রামবাসী মাত্র বাস করে। আমরা কুম্জাং পাড়ায় আট দিন বাস করিলাম এবং পর সেখান হইতে রওনা হইয়া ছয়দিনে ছাইরাংচুকে পৌঁছিলাম। রাংরুং হইতে ছাইরাংচুকের সীমা পর্য্যন্ত যে সমস্ত লোক বাস করে তাহাদিগকে কুকি বলে। রূপিনী পাড়া, তৈজল পাড়া, কুম্জাং এবং ছাইরাংচুক—এই চার জায়গার লোকেরা ত্রিপুরা রাজাকে প্রতি বৎসর. —হাতীর দাঁত, গবয়, খেসু কাপড়, গোল মরিচ এবং কার্পাস দেয়। ছাইরাংচুকে আমরা বার দিন রহিলাম। সেখানে দেওগাং নামে একটি নদী আছে। ঐ নদীতে বাঁশের ভেলা বাঁধিয়া তাহাতে উঠিয়া আমরা ভাটীতে

নামিয়া তাসিলাম এবং পরে মল্ল নদী দিয়া উজাইয়া এবং রাস্তায় একরাত্রি বাস করিয়া আমরা কেপ্পায় উপস্থিত হইলাম।

কেপ্পা হইতে আবন্ত করিয়া রাজধানীর নিকট পর্য্যন্ত যে সকল লোক বাস করে তাহাদিগকে ত্রিপুরা বলে। তাহারা মদ ও শূকর খায়, মৃত ব্যক্তিকে দাহ করে এবং একমাসে শুদ্ধ হয়। ছোমতায়্যা (চোন্তাই) নামে একদল লোক আছে। তাহারা আমাদের দেশের দেওধাইদের মতন এবং আমাদের দেওধাইদের অনুকূপ কাজকর্ম করে। কেপ্পা হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ব্বতে যে সকল লোক বাস কবে তাহারা ত্রিপুরা রাজাকে বৎসর চার টাকা করিয়া কর দেয়।

নবম অধ্যায়

ত্রিপুরার দূতগণের সঙ্গে আমরা ত্রিপুরায় পৌঁছিলাম

আমরা কেপ্পায় তেরদিন থাকিয়া সেখান হইতে রওনা হইয়া দুই দিনে ছোট মরিছরাই, বড় মরিছরাই পাড়ায় উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে ত্রিপুরার দূত রামেশ্বর জ্যোত্স্নার রাজাকে খবর দিবার জন্ত আগে বাড়িয়া গেলেন। সেই জায়গায় আমরা চার দিন বাস করিলাম এবং পরে সেখান হইতে রওনা হইয়া চার দিনে খাকরাই নদীর ধারে আসিলাম। খাকরাই নদীর ধারে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইল। সেখান হইতে রাজধানী চার দণ্ডের রাস্তা মাত্র দূরে। সেই দিন উদয়নারায়ণ আমাদের পৌঁছিবার খবর জানাইয়া রাজার নিকট মাহুঘ পাঠাইয়া দিলেন। সেই দিন আমরা খাকরাইতে রাত্রিবাস করিলাম। পরের দিন রাজা আমাদের জন্ত সিধা

পাঠাইয়া দিয়া এই বলিয়া খবর দিলেন যে “আজ তাহারা সেখানেই ভোজনাদি করিয়া থাকুক, আগামীকাল্য লোক গেলে তাহাদের সঙ্গে আসিবে।” পরদিন আমরা দুই দূতের জন্ত দুই ঘোড়া এবং উদয়নারায়ণের জন্ত এক ঘোড়া মোট তিনটি ঘোড়া পাঠাইলেন এবং আমাদেরকে আগবাড়াইয়া নেওয়ার জন্ত তীর, ধনুক ও গাদা বন্দুকধারী চল্লিশ জন লোক দিয়া কালারাই নামে একজন হাজারিকে পাঠাইয়া দিলেন। অনুমান ছয় দণ্ড বেলা থাকিতে আমরা থাকরাই ছাড়ার পাড় হইতে ত্রিপুরার রাজ্য রত্নমাণিক্যের নগরে পৌঁছিলে আমাদেরকে গোমতী নদীর পাড়ে বাসা এবং খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। চৈত্র মাসের পনের দিন গত হইলে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের নগরে পৌঁছিলাম। তারপর আমাদের এবং আমাদের সঙ্গে লোকজনের জন্ত একটি সিধা দেওয়া হইল। দুই দিনের পর মাসিক হিসাবে নিয়ম করিয়া আমাদের জন্ত শিধা দেওয়া হইল। সিবর মাসিক জায় যথা—আমাদের দুইজন দূতের জন্ত মিহি আতপ চাউল ৪ মন, মুগ ডাইল ১০ সের, মার্সকলাই ডাইল ১৫ সের, খেসারি ডাইল ১২ সের, লবণ ১০ সের, তৈল ১০ সের, ঘৃত ৬ সেব, চিনি ৩ সের, গুড় ১২ সের, গোলমরিচ ২ সের, আদা ৮ সের, হলুদগুঁড়া ১ সের, কালীজিরা আধ সের হিং ৪ তোলা, দারুচিনি ৮ তোলা, কবুতব ৩০ জোড়া, সুপারি ১৥৬০ কাহন, এবং তামাকপাতা ৮ সের। ঐগুলি ছাড়া প্রতিদিনের জন্ত ধার্য ছিল মহিষের কাঁচা দুধ ৪ সের, মাছ ৪ সের, জালানি কাঠ ৪ ভার এবং বরজের পান ৪ আঁটি। প্রতিদিন পূজার জন্ত দিত—ফুল, তুলসী, দুর্বা এবং বেলপাতা। আমাদের ৩৪ জন পাইকের জন্ত মাসিক দিত—মোটা চাউল ৩৪ মন, মাসকলাই ডাইল দেড় মন, খেসারি ডাইল আধ মন, লবণ দেড় মন, তৈল ৩৪ সের, আস্তহলুদ ১০ সের, ভোটমরিচ ১০ সের, গুড় ৩৪ সের, তামাকপাতা ২০ সের, শুখনা সুপারি ২ কাহন, এবং হাঁস ৬০টি। তাহা ছাড়া যাহাতে আমাদের লোকেরা কিনিয়া খাইতে পারে সেজন্ত একটি হাট বসাইয়া দিয়াছিল। আমাদের লোকদের জন্ত দৈনিক দিত—জালানি কাঠ

৮ ভাব, পাতা ২ বোঝা, ববজেব পান ৪ আটি। সকলের জন্ত মাসিক দিত—
খাসী ৫টা এবং আট দিন পব পব পাক কবাব জন্ত হাঁড়ি দিত ৪০টি
এবং চামাবে এক পাতিল চুন দিত। কাপড় খুইবাব জন্ত ধোপা
এবং চুল দাড়ি কাটিবাব জন্ত নাপিত দিয়াছিল। তাহা ছাড়া আমাদিগের জন্ত
হাড়ী ও দিয়াছিল। এইরূপে তাহাবা আমাদিগকে যোগান দিয়াছিল।

দশম অধ্যায়

ত্রিপুরা রাজ্যের ও রাজধানীর বিবরণ।

ত্রিপুরা রাজ্যের বাড়ির চারিদিকে ইষ্টক নির্মিত গড়। ইহা উচ্চতায় ৬ হাত
সমান হইবে। পববিব হিসাবে স্বর্গদেবের বংশুবেব ভিতরের দুর্গটির সমান
হইবে। এই দুর্গটির সম্মুখে ঐ ইষ্টক তৈয়্যাবী গড়ের সঙ্গে লাগাইয়া মাটি
দিয়া একটি গড় বাঁধা হইয়াছে, ইহাব উচ্চতা ও পূর্ব কথিত গড়টির মতন
হইবে। উভয় গড়ের দূরত্ব আমাদেব দাবিকিয়াল চুয়াব হইতে বড় চবাব
মাথাব রাস্তার দূরত্বের অনুমান অর্ধেক হইবে। এই একটি দুর্গ। এই দুর্গের
দুয়ার দক্ষিণমুখী। ইহাতে পূবে পশ্চিমে লম্বা একটি কুঁজিঘর আছে। এই ঘরের
দুইদিকে ইষ্টক নির্মিত ভিটা আছে, উহা উচ্চতায় অনুমান পাঁচ হাত
হইবে। মাঝখানে রাস্তা। এই রাস্তা দিয়া জোড়া হাড়ী যাইতে পারে।
এই ঘরের কোনও দুয়ার নাই; সারাদিন খোলা থাকে। এই ঘরে তীর,
ধনু, গাদা বন্দুক, ঢাল, তরোয়াল লইয়া ৪০ জন লোকসহ একজন হাজারি
থাকে। এই ঘরটিকে রুপার দুয়ারী ঘর বলে। পূর্বে এই ঘরের দুয়ারে
রুপার পাত মাঝা ছিল এবং উপরে রুপার ঘট ছিল, এ জন্ত লোকে ইহাকে
রুপার দুয়ারী ঘর বলে। রত্ন মাণিক্য রাজার পিতা রাম মাণিক্য রাজার

সময়ে এই ঘরটি পুড়িয়া যাওয়ার পর হইতে আর উহাতে রূপার ঘট বা ছয়ার নাই। ঐ ঘরের পূর্বদিকে অনুমান একবাঁও (চারি হাত) ভিতরের দিকে ইষ্টক নির্মিত ভিটার উপরে একটি চৌচালা ঘর আছে, তাহাতে রাজা ষ্ট্রীয়াপ্রতিমা গড়িয়া পূজা করেন। সেই ঘরের নিকটে অনুমান ৩০ হাত উঁচু একটি মন্দির আছে; এই মন্দিরে দোলযাত্রার উৎসব হয়। এই মন্দিরের উপরিভাগে ছন ও বাঁশ দিয়া চারিচালা ঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে। পশ্চিমদিকে ইটের তৈয়ারী বিষ্ণুর এবং শিবের দুইটি মন্দির আছে; ঐগুলিও উচ্চতায় প্রায় ২০ হাত হইবে। এই দুই মন্দিরের সম্মুখে ইটের ভিটার উপরে ছন বাঁশের ছাউনি দেওয়া একটি চৌচালা ঘর আছে। সেই ঘরের ভিটা হইতে এক হাত অনুমান উঁচু করিয়া মানুষ আরাম করিয়া বসিবার জগু বাঁধিয়া দিয়াছে এবং তাহার উপরে চারিদিকে চারিটি চাল দিয়াছে কিন্তু তাহাতে বেড়া নাই। এই ঘরে ৮ জন ব্রাহ্মণ দিনরাত অবিরাম পালাকর্তন গান করে। বিষ্ণুমন্দিরে পাথরের তৈরী লক্ষ্মী সরস্বতীর সঙ্গে গোপীনাথ নামে বিষ্ণুর মূর্তি আছে; এই বিগ্রহ ব্রাহ্মণে পূজা করে। শিবের মন্দিরে পাথরের তৈরী গণেশ ও কার্তিকের সঙ্গে বৃষ আরোহণে শিবের মূর্তি আছে, সেখানেও ব্রাহ্মণে পূজা করে। এই দুই জায়গার নির্মাণ্য প্রতিদিন রাজাকে দেওয়া হয়।

রূপার ছয়ারী ঘর হইতে কিছু দূর গিয়া আড়াআড়ি ভাবে কাঠ ও বাঁশের তৈরী একটি কুঁজি ঘর আছে। সেই ঘরে শাল কাঠের খুঁটি দিয়া তাহাতে কলকা কাটিয়া শির তুলিয়া দিয়াছে; পাইরের দুই মাথায় ঠাকুরার মুখ কাটিয়া ঘোর রক্তবর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই ঘরের কাঠি, কাইম, রুয়া, পাট, বেত সমস্তই ঘোর রক্তবর্ণ করিয়া রং করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাইমের উপরে লম্বা শীতলপাটি বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে; উহার উপরে ছন দিয়া ছাওয়া হইয়াছে। সেই ঘরের উপরে একটি সোনার ঘট দেওয়া হইয়াছে। এই ঘরের মধ্য দিয়া রাস্তা; রাস্তার দুই ধারে আট হাত পরিমাণ উঁচু ইটের ভিটা; ইহাকে সোনার ছয়ারী ঘর

বলে। এই ঘরের ছই ধারে ভিটার উপরে পাটি বিছায়, পাটির উপরে গালিচা পাতে; এই গালিচায় বসিয়া বড় লোকেরা কথাবার্তা বলেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের দেশের বড়লোক ও পাত্র-মন্ত্রীদের বর্ণনা।

রাজবংশীয় যুবরাজ একজন—তাহার উপরে আরোয়ান ধরা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের এখতিয়ার যতখানি আছে তাহার সমস্ত ক্ষেত্রেই যুবরাজের আদেশ বলবতী হয়। তাহা ছাড়া কর, খাজনা, জিনিসপত্র, হাতী-ঘোড়া, চাকর, সিপাহী ইত্যাদির তিনিই ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিলে সকলকে নিয়মশৃঙ্খলা করিয়া তিনিই পরিচালনা করেন, প্রয়োজন হইলে নিজেও যান। রাজ্য তাঁহাকে আলাদা করিয়া গ্রাম ও পরগণা দিয়াছেন। সেই সব স্থান হইতে টাকা উঠাইয়া যুবরাজ নিজে খরচ করেন এবং সঙ্গের চাকর ও সিপাহীদিগকে দেন।

রাজবংশীয় বড় ঠাকুর একজন। তাঁহারও আরোয়ান আছে। রাজ্য আলাদা করিয়া তাঁহাকেও গ্রাম ও পরগণা দিয়াছেন। তাঁহার পদ যুবরাজের নীচে। যুবরাজ এবং বড় ঠাকুরের সঙ্গে নিশানধারী নিশান বহন করে। যুবরাজ এবং বড় ঠাকুরের বাড়িতে প্রহরী পাহারা দেয়।

তাহা ছাড়া উজীর একজন, নাজীর একজন, নেমুজীর একজন এবং কোতোয়াল মুন্সিব একজন আছে। তাহারা আমাদের সেখানের বড়বড়িয়া এবং ফুকনেরা যেমন সেইরূপ। এই সমস্ত পদবীর লোকেরা ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের সম্পত্তিতে অণু কেহ মালিক হইতে পারে না।

হিন্দুর দেওয়ান একজন। তাহাকেও রাজ্য গ্রাম এবং পরগণা দিয়াছেন। তিনি ঐসব জায়গা হইতে খাজনা আদায় করিয়া নিজে ব্যবহার করেন, এবং সঙ্গের লোকজনকেও দেন। দেশ-দেশান্তর হইতে লোক আসিলে দেওয়ানকে কথা বলিতে হয়। কোনও জিনিস কাহাকেও দিতে হইলে তিনি দেন; দেশের সমস্ত বিষয়ের লেখাপড়া তিনিই করেন।

খানসামা বড়িয়া একজন। রাজ্যের সমস্ত ভাণ্ডারের উপর তাহার কর্তৃত্ব চলে। অগ্ৰাণ্য বড়িয়া, হাজারি ও ভাল লোকেরা ঐ সোনার ছহারী

ঘরে বসিয়া কাজ-কারবার করে। রাজা এই ঘরে বসেন না। এই ঘরের পূর্বদিকে একটি হাতিশাল আছে। সেখানে রাজা চড়িবার জন্ত দাঁতাল দুইটি এবং কুনকী হাতি দুইটি আছে। পশ্চিম অংশে একটি ঘোড়াশাল আছে ; তাতে অহুমান একশত ঘোড়া থাকে।

সোনার দুয়ারী ঘব হইতে কিছুদূর গিয়া ভিতরের দুর্গের ইটের গড়ের লাগা কাঠ-বাঁশের তৈরী একটি ঘর আছে। সেই ঘরের ভিতা ইটের তৈরী এবং ইহা অহুমান ৭ হাত উচু হইবে। ইহার দেওয়ালও ইটের তৈরী। প্রথম দিকের তিন কোঠার পর রাস্তার উপর আড়াআড়ি ভাবে ইটের তৈরী দেওয়াল ; তার ভিতরেও দুইটি কোঠা আছে। সেই ঘবের সামনের দিকে দক্ষিণ দিক ধরিয়া পশ্চিম অংশে শিড়িকাটা একটি রাস্তা আছে। সেই ঘরের ভিতর দিকে রাজার অন্দব হইতে আসা যাওয়ার জন্ত একটি বাস্তা আছে। সেই ঘরের তিন কোঠা বাদে ভিতরেব দুইটি কোঠায় রাজাব সেবকেরা ছাড়া আর কেহ যাইতে পারে না। সেই ঘবে সকলে যাইতে পারে না, কেবলমাত্র রাজা যাহাকে আদেশ দেন সেই সেখানে যাইতে পাবে। সেই ঘবের অপর তিন কোঠায় খাট পাতিয়া তার উপরে রঙ্গিন পাটী বিছাইয়া তার উপরে গালিচা পাতিয়া দেওয়া আছে। তার উপরে সম্পূর্ণ হাতীর দাঁতের তৈরী একটি সিংহাসন সাজাইয়া রাজা বসিবার জন্ত পাতিয়াছে। সেই সিংহাসনের উপরে পাট কাপড়ের গদি দিয়া তার উপরে বনাত পাতিয়াছে। সেই বনাতের চারিদিকে সোনার ঝালর দেওয়া হইয়াছে। সিংহাসনের উপরে কিংখাব কাপড়ের তৈরী বালিশ আছে ; রাজা সেই সিংহাসনে বসেন। সেই ঘরের তিন কোঠা জুড়িয়া একখানা কার্পাস সূতার তৈরী চান্দোয়া খাটান হইয়াছে। সেই ঘরের খুঁটাগুলি কর্মিজের কাপড় দিয়া মোড়ান। সিংহাসনের উপরে চান্দোয়া টানান আছে এবং সেই চান্দোয়ার মধ্যস্থলে সোনার গোলাকৃতি করিয়া কাজ করা আছে। সেই ঘর সব সময় এইরূপ সাজান থাকে। এই ঘরটিকে লোকে সিংহাসনের ঘর বলে। এই ঘরের ভিতর দিকের দুইটি কোঠায় রাজার জন্ত স্থপাশি

কাটা হয় এবং রাজার সেবকেরা থাকে। এখন হইতে ভিতরের দিকে রাজা যাহাকে ডাকেন সেই কেবল যাইতে পারে। এই ঘরের পশ্চিম দিকে অনুমান তিন বাঁও (বার হাত) দূরে একটি ছয়ার আছে ; তাহাকে লোকে খিড়িকি ছয়ার বলে ; তার উপরে কোনও ঘর নাই। ছই ধারে ছইটি খুঁটা, বসাইয়া তার উপরে একটি পাট পাতিয়া একচালা বানাইয়া উহার ঠুপরে ইটের গাঁথনি দিয়াছে। নীচে গড়খাতের ভূমির সমানে প্রধান ছয়ার অবস্থিত। সেই ছয়ারের পশ্চিম দিকে গড়ের কিনারায একটি ঘোড়াশাল আছে। সেখানে রাজা চড়িবার জন্য ছইটি তুর্কী, ছইটি তাজী এবং ছইটি মেখলী রাজার আনা টাঙ্গন ঘোড়া, মোট ছয়টি ঘোড়া আছে।

সেই ছয়ার হইতে অনুমান চারি বাঁও দূরে কাঠ বাঁশের তৈরী চৌচালা একটি ঘর আছে। এই ঘরের ভিটা ইটের তৈরী এবং উচ্চতায় অনুমান এক হাত হইবে। তার সামনের দিকে একটা ফাঁকা জায়গা আছে ; সেই জায়গাটি ইট দিয়া বাঁধান হইয়াছে। সেই ঘর হইতে ফাঁকা জায়গাটার দিকে অনুমান এক বাঁও চওড়া করিয়া এবং এক বিঘত উঁচু করিয়া ইট দিয়া বাঁধিয়া ঐ ঘরের সঙ্গে লাগাইয়া দিয়াছে এবং ইহাতে প্রায় এক হাত উঁচু করিয়া গোল গোল বসিবার স্থান পাকা কবিয়া দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত ঘর জুড়িয়া কার্পাস তুলার স্ত্রতায় তৈরী একটি চান্দোয়া খাতান হইয়াছে। সমস্ত ঘর ব্যাপি ধারি পাতা, তার উপরে, লাল পাটী এবং তার উপরে গালিচা পাতা আছে। উহার উপরে স্নজনি পাতিয়া রাজা বসেন। রাজার স্নজনিটি একটি টুকরা কাপড়ের উপর অঙ্গ করিয়া তুল দিয়া ফুল বানাইয়া তৈরী করা হইয়াছে। সেই স্নজনিটির চারি ধারে পানের আকৃতিতে বনাত দিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাতে স্বর্ণ খচিত আছে। এই স্নজনির উপরে ছোট বালিশ চারিটি এবং বড় বালিশ একটি আছে। কোন কোন সময়ে রাজা উহার উপরে বসেন। রাজা কাহাকেও ডাকিলে সে সেখানে প্রবেশ করিতে পারে। একদিন আমাদিগকে সেই জায়গায় ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। রাজা ভিতর হইতে সেই ঘর পর্য্যন্ত

আসিবার জন্ত একটি ইটের তৈরী রাস্তা আছে। সেই ঘরের ঈশান কোণে ইটের তৈরী একটি মন্দির আছে। সেই মন্দিরে রাজা পূজাআর্চা করেন।

সিংহাসনের ঘর হইতে লম্বায় ইটের গড় আছে। সেই গড় গিয়া পিছন দিকের গড়ের সঙ্গে লাগিয়াছে। সেই গড়ের ভিতরে রাজা থাকিবার জন্ত ইটের ও ছন-বাঁশের ঘর আছে। ভিতরের ছুর্গের গড়খাতের কিনারায় তাল ও নারিকেলের গাছ আছে। ছুর্গের বাহিরে পূর্ব দিকে সোনার, রূপার ও অস্ত্রাস্ত্র দ্রব্যের ভাণ্ডার আছে; রাজার পাটেশ্বরীর ভাণ্ডার আছে এবং ছন-বাঁশের তৈরী ১০টী ঘর আছে। ঐ সমস্ত ঘরে জিনিস পত্র ও আছে। ঐ জায়গার পূর্ব দিকে অনুমান ১০০ বাঁও দূরে ছুইটি ইটের তৈরী কুঠরি আছে; ঐ গুলিতে গোলা-বারুদ রাখা হইয়াছে। ছুর্গের পূর্ব ও উত্তর দিকে ঢপলীয়া পর্বত। সেখানে ত্রিপুরাদের ঘর-বাড়ি আছে। তাহাদের বাড়িতে আম, কাঠাল, বেল, নারিকেল, তাল, সুপারি ইত্যাদি জন্মে। এই ছুই দিকে জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত। এই পর্বতের মাঝে মাঝে ত্রিপুরারা বাস করে। সেখানে আদা, তরমুজ, ধান, কার্পাস, কচু, কুমড়া, আলু, কাঙন ইত্যাদি জন্মে।

এই ছুর্গের পশ্চিম দিকে ছুর্গের গড়ের কিছু দূরে গোমতী নদী বহিয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে রাজার বাড়ির দরজার সামনে একটি হাট আছে, এই হাটকে লোকে রাজহাট বলে। এই হাটে তামা, পিতল, হিং, লবঙ্গ জাতিফল, কাপড়, কার্পাস, হুন, চিনি, বাতাসা, দুধ, ক্ষীর, ঘৃত, হলুদগুঁড়া ইত্যাদি সকল দ্রব্য আসে। এই হাটের মধ্য দিয়া রাজপথ গিয়াছে। এই পথের ছুই ধারে বণিক, ব্যাপারী এবং অস্ত্র যাহারা বাজারে কেনা-বেচা করে তাহাদের হাট উপযোগী লাগালাগি ঘর আছে। ঐ সব ঘরের সামনে লোকান আছে এবং পিছনের দিকে বেল ও নারিকেল গাছ আছে। কোন কোন ঘরের সম্মুখে ইট দিয়া বাঁধিয়া লোকে তুলসী গাছ লাগাইয়াছে এবং উহাতে প্রাতিদিন পূজা করে। রংপুরের বড়হুয়ারের সম্মুখ হইতে জেরেঙ্গার পুকুর যতদূর অনুমান ততদূর ব্যাপি একরূপ লাগালাগি হাট

উপযোগী ঘর রাস্তার দুই ধারে আছে। এই রাস্তার মধ্যে মধ্যে বাজার আছে। এই রাস্তার মধ্যস্থল হইতে অগ্নিকোণের দিকে অপর একটি রাস্তা গিয়াছে। উহা আমাদের এখানের বড়চরা হইতে ঔগুরিহাট অম্মান লম্বা হইবে। এই রাস্তার দুই দিকে কেনা-বেচা করার লোকদের ঘর আছে, সেখানে বাজারও আছে।

এই রাস্তার মাথায় ইটের ভিটার উপরে কাঠ ও বাঁশের তৈরী দুইটি চৌচালা ঘর আছে। সেই দুই ঘরে চতুর্দশ দেবতার মূর্তি আছে। এই দেবতার পূজা বৎসরে এক দফে হয়। দেওধাইদের মতন ছোমতায়্যা (চোন্তাই) নামে একদল লোক আছে, তাহারা এই দেবতার পূজা করে। তাহারা সেখানে মহিষ, গবয়, শূকর, মুরগী, হাঁস, কবুতর, পাঁঠা, হরিণ, মাছ, কচ্ছপ ও মদ দিয়া এই পূজা করে। পূজার স্থানে রাজাও আসেন।

এই রাস্তার মাথায় গোমতী নদী ঘুরিয়া গিয়াছে। নদীর অপর পাড়ে জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত ; সেখানে ত্রিপুরারা বাস করে। তাহা ছাড়া মঘদেশ বিজয় করিয়া যেসব লোক আনিয়াছে তাহাদিগকেও সেখানে বসান হইয়াছে। তাহারা ধান, কাপাস ইত্যাদি শস্য উৎপন্ন করে। ঐ রাস্তার পূর্ব দিকে ঢপলীয়া পর্বত। এই পর্বতে ত্রিপুরাদের ঘরবাড়ী আছে। তাহাদের বাড়ীতে আম, কাঠাল ইত্যাদি ফলে। সেদিকে কেবলই পর্বত, তাহাতে ত্রিপুরারা বাস করে। সেখানে ধান, কাপাস ইত্যাদি শস্য হয়। ঐ পর্বতের নিকট হইতে দুর্গের কিনারা পর্যন্ত ত্রিপুরাদের এবং বড়লোকদের বাড়ী আছে। তাহাদের বাড়ীতেও তাল নারিকেল ইত্যাদি বৃক্ষ আছে। দুর্গের পশ্চিমদিকে দুর্গের নিকট বড় ঠাকুরের বাড়ী আছে। তার পশ্চিমদিকে ত্রিপুরাদের বাড়ী আছে। গোমতী নদীর অপর পাড়ে পূবে-পশ্চিমে লম্বা একটি রাজপথ আছে। সেই রাস্তার উপরে নদীর ধারে একটি বন্দর আছে। এই বন্দরে তামা, পিতল, কাপাস, কাপড়, লবণ, তৈল, ঘৃত ও অন্যান্য জিনিস আসে। সেখানে লোকেরা তাহাদের ঘরে ধান, চাউল, ডাইল, সরিষা, তামাকপাতা ইত্যাদি সাজাইয়া রাখে এবং বেচা-কেনা করে।

সেখানে বাংলা দেশের লোকেরা আসিয়া কাপড় ও বনজ জিনিসপত্র বেচা-কেনা করে। এইরূপে প্রতিদিন রাত্রি প্রভাত হইতে রাত্রির এক প্রহর পর্যন্ত লোকে সেখানে বেচা-কেনা করে। রাস্তার উত্তরদিকে নদীর পাড়ে হুর্জয় সিংহ যুবরাজের বাড়ী আছে। তাহার বাড়ীর চারিদিকে ইটের তৈরী গড় আছে। সেই গড়ের বাহিরে ইটার ভিটার উপর একটি চৌচালা ঘর আছে ; সেখানে বসিয়া তিনি লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন। সেই ঘর হইতে পশ্চিম-উত্তরদিকে বাঙ্গালী লোকদের বাড়ী আছে। সেই রাস্তার দুই দিকেই হাটে যাহারা বেচা কেনা করে তাহাদের বাড়ী আছে, নগরের লোকদিগের ও বাড়ী আছে। অনুমান দুই প্রহরীর পাহারার কালের সমান রাস্তা ব্যাপি তাহাদের বাড়ী আছে। এই সকলের বাড়ীতে দুই চারিটি করিয়া তাল, নারিকেল, বেল ও সুপারি গাছ আছে : এই রাস্তায় তিনটি হাট আছে।

রাস্তার দক্ষিণ দিকে চম্পক রায় যুবরাজের একটি পুকুর আছে ; অনুমান ৬ পুরা জায়গা লইয়া এই পুকুরটি অবস্থিত। এই পুকুরের পশ্চিমদিকে একটি ইটের তৈরী দালান আছে। পুকুরের জলের মাঝখানে আট কোণা ইটের ভিটার উপরে আট কোণায় আটটি খুঁটা বসাইয়া তাহাতে কাঁসার পাত মারিয়া তাহার উপর আট কোণা করিয়া তামার দোলমঞ্চ তৈয়ার করা হইয়াছে। ঐ দোলমঞ্চে রাজা রত্নমাণিক্য কালিয়-দমন অভিনয় করিয়া বসিয়াছিলেন। সেই জায়গায় আমাদিগকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। পুকুরটির চারি পাড় ইট দিয়া পাকা করা ছিল। ইহার পাড়ে ফুল, নারিকেল, বেল, ডালিম এই সকল গাছ ছিল। রাস্তার উত্তর ধারে অনুমান আধপুরা জায়গা ঘেরাটি করিয়া পাথর দিয়া একটি গড় বানানো হইয়াছে, গড়টি উচ্চতায় অনুমান পাঁচ হাত হইবে। এই গড়ের ভিতরের মাঠটা পাথর দিয়া পাকা করা হইয়াছে। গড়ের ভিতরে পূর্ব দিকে পাথরের তৈরী একটি মন্দির আছে ; ইহা উচ্চতায় অনুমান ২০ হাত হইবে। এই মন্দিরে পাথরের চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি আছে। এই মন্দিরের উত্তরে

অমুমান ১৮ হাত উচ্চ গগনর একটি পাথরের মন্দির আছে। এই মন্দিরে বৃষভবাহন শিবের মূর্তি আছে। সেই জায়গায় একটি পাথরের তৈরী কুঁজিঘর আছে ; সেখানে পাথরের ছাঁচের দণ্ডভূজা মূর্তি আছে। এই তিন জায়গায় প্রতিদিন ব্রাহ্মণে পূজা করিয়া রাজাকে নিশ্চাল্য দেয়। পূজারী ব্রাহ্মণ থাকিবার জন্য সেখানে পাথরের একটি ঘর আছে। পালা ক্রমে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ সেখানে থাকিয়া বিগ্রহের সেবা পূজা করে।

তাহার উত্তর দিকে গোমতী নদী মোড় দিয়াছে। সেই নদীর অপর পাড় হইতে জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত। সেখানে ত্রিপুরারা বাস করে এবং ধান ও কাপাস উৎপন্ন করে। রাস্তার দক্ষিণ দিকে অমর সাগর নামে একটি দীঘি আছে। উহা লম্বায় আমাদের রংপুরের পুকুরটির মতন হইবে এবং পাশে উহার অর্ধেকের চেয়ে কিছু বড় হইবে। এই দীঘির পূর্ব পাড়ে ইট, কাঠ এবং বাঁশ দিয়া তৈরী রাজবংশীয় ছইজন ঠাকুরের বাড়ী আছে। এই ছইজনের সঙ্গে নিশান লইয়া লোক যায় এবং নাকারা বাঘ ও বাজাইয়া যায় ; তাহাদের বাড়ীতে প্রহরী পাহারা দেয়। এই দীঘির চতুর্দিকের পাড়ে নগরের লোকেবা, তাঁতী, স্বর্ণকার, কামার, কুমার, চামার, সূত্রধর, ধোপা, বাড়ই এই সকল লোকের বাড়ী আছে। ইহার পশ্চিম দিকে কিছু দূরে আরও একটি দীঘি আছে ; এই দীঘির নাম বিজয়সাগর। এই দীঘি বিজয় মাণিক্য রাজা কাটাইয়া ছিলেন। বিজয়সাগর দৈর্ঘ্যে আমাদের তেলিয়াডোঙ্গার পুকুরটির মতন বড় হইবে এবং প্রস্থে উহার অর্ধেকের চেয়ে কিছু বড় হইবে। ইহার চারি পাড়ে নগরের লোকদের বাড়ী আছে। উক্ত ছই দীঘির মধ্যখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, দৈবজ্ঞ, বৈদ্য, মালী এই সকলের বাড়ী আছে। এই দীঘির উত্তর পাড়ে চম্পকরায় যুবরাজের তৈরী ইষ্টক নির্মিত একটি মন্দির আছে। তাহার পশ্চিমে রাম মাণিক্য রাজার কাটানো একটি দীঘি আছে, তার নাম রামসাগর। রামসাগর বিজয়সাগর অপেক্ষা কিছু ছোট।

রামসাগরের দক্ষিণ পাড়ে ইষ্টক নির্মিত একটি মন্দির আছে ; সেখানে

সদাশিবের লিঙ্গ আছে। এই বিগ্রহকে ব্রাহ্মণ পূজা করে। এই দীঘির পাড়ে রাজার পুরোহিত, সভাপণ্ডিত ও অগ্ণ্য ব্রাহ্মণদের বাড়ী আছে। এই দীঘির দক্ষিণে এবং পশ্চিমে দুই দিকে এক প্রহরের রাস্তা পর্য্যন্ত উন্নত গ্রাম। সেখানের লোকেরা চাষবাস করে, বাড়ী-খেরী ও করে এবং গরু মহিষ ও রাখে। তাহার দক্ষিণ দিকে জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত।

পশ্চিম দিকে গ্রামের সীমানা হইতে অল্পমান ছয় দণ্ডের রাস্তা গেলে জঙ্গলাকীর্ণ ঢপলীয়া পর্বত পাওয়া যায়। সেই পর্বতের মাথায় উপরিভাগে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা করিয়া মাটি দিয়া একটি গড় বাঁধা হইয়াছে; উহা উচ্চতায় অল্পমান ৯ হাত হইবে। এই গড়টি লম্বায় কত বড় তাহা আমবা বলিতে পারিব না। গোমতী নদী এই গড়ের মধ্য দিয়া গিয়া বাংলা দেশের নদীব সঙ্গে মিশিয়াছে। লোকে এই গড়ের নাম চণ্ডীগড় বলে। ইহাকে চণ্ডীগড় বলিবার কারণ এই যে পূর্বে অমর মাণিক্য রাজা নিজ রাজ্যের সীমানা হইতে দুই দিনের পথ সোনার গাঁও পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তিনি দুই বৎসর সোনার গাঁয়ের খাজানা ও আদায় করিয়াছিলেন। তারপর মুসলমানদের সঙ্গে অমর মাণিক্যের যুদ্ধ বাধিল। সেই দিক হইতে মুসলমানেরা অমর মাণিক্যের সৈন্তগণকে খেদাইয়া আনিল। শেষে এই পর্বতে আসিয়া উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। তারপর রাজা এই পর্বতে চণ্ডী ঠাকুরানীর পূজা করিলেন এবং পরে অনেক মুসলমান মারিয়া চণ্ডী ঠাকুরানীর অল্পগ্রহে রাজা অমর মাণিক্য যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। তারপর রাজা অমর মাণিক্য সেই পর্বতে গড় তৈরী করাইয়া তাহার নাম চণ্ডীগড় রাখিলেন। লোকে এই কারণে এই পর্বতকে চণ্ডীগড় বলে। এই গড়ে পাহারাদার থাকে; তাহার ত্রিপুরা রাজার ছাড়-পত্র থাকিলে আসা-যাওয়ার লোক ছাড়িয়া দেয়।

এই গড়ের পরে ছয় দণ্ডের পথ দূর পর্য্যন্ত জঙ্গলের মধ্যে দিয়া রাস্তা আছে। এই জঙ্গলের পর হইতে মুসলমান রাজ্যের সীমানা দুই দিনের পথ দূরে মাঝখানে উন্নত গ্রাম আছে। সেখানে আছে—মেহেরকুল পরগণা

১টি, খণ্ডল পরগণা ১টি, মণ্ডল পরগণা ১টি, বকাছাই পরগণা ১টি, লোহাগড় পরগণা ১টি, তিচিনা (তৃষ্ণা) পরগণা ১টি, তিলি পরগণা ১টি, লোননগর পরগণা ১টি, লাঙ্গলীয়া পরগণা ১টি, মির্জাপুর পরগণা ১টি, ভূছনা পরগণা ১টি, বিহগাঁও পরগণা ১টি, কৈলাসহর পরগণা ১টি এবং ধর্মনগর পরগণা ১টি। এই সমস্ত পরগণায় ধান, কলাই, সরিষা ইত্যাদি শস্য জন্মে। তাহা ছাড়া এই সমস্ত স্থানে কাপাস স্তার মিহি কাপড়, পটুকা, পাগড়ি ইত্যাদি জিনিস প্রস্তুত হয়।

ধর্মনগরের পশ্চিমধার হইতে এক প্রহরের রাস্তা পর্য্যন্ত জঙ্গল। এই জঙ্গলের পর হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমানেরা বাস করে। ধর্মনগরের উত্তর দিকে একদিনের রাস্তা পর্য্যন্ত জঙ্গল; সেখানে ধলেশ্বর গাং নামে একটি নদী আছে। সেখান হইতে এদিকে (উত্তরের দিকে) কাছাড়ী রাজার অধিকার। এই নদীটি কাছাড়ী রাজার রাজ্যের সীমার নিম্নদিকে আসিয়া মুসলমানের বোন্দাশীল থানার উজানে বরাক নদীতে পড়িতেছে। ঐ বরাক নদীর এদিকে কাছাড়ী রাজার রাজত্ব। এই পরগণাগুলির মধ্যে কতকগুলি হইতে ত্রিপুরা রাজা, কতকগুলি হইতে ত্রিপুরার রাজ মহিষীরা এবং কতকগুলি হইতে ত্রিপুরা-রাজবংশীয়েরা খাজানা আদায় করেন। তাহা ছাড়া অগ্রাণ্ড বড়লোকদের মধ্যে রাজ্যের নিয়মানুযায়ী খাজানা আদায় করিবার জন্য পরগণা বিভাগ করিয়া দেওয়া আছে। রাজার নগরের দক্ষিণে গোমতী নদীর অপর পাড়ে একটি ইষ্টক নির্মিত মন্দির আছে; উহা উচ্চতায় অনুমান ৪০ হাত হইবে। ঐ মন্দিরে ত্রিপুরা ঠাকুরানীর মূর্তি আছে। ঐ মন্দিরের অগ্নিকোণে পর্ব্বতের ভিতরে কুণ্ডজটীয়া নামে এক তীর্থ আছে; সেই কুণ্ডের নাম ডম্বর। সেই কুণ্ডের জল সর্ব্বদা ধোঁয়া হইয়া থাকে। সেই ধোঁয়ার মধ্যে অগ্নি-শিখার মতন দেখা যায় কিন্তু এই কুণ্ডের জল গরম নহে। ত্রিপুরা রাজার দেশের ও নগরের লেখা সমাপ্ত।

প্রকাদশ অধ্যায়

ত্রিপুরা রাজার পূর্বপুরুষদের কথা

পূর্বে ত্রিপুরা রাজার পূর্ব-পুরুষদের রাজা উপাধি ছিল না। আমাদের দেশের খুনবাউ নাগারা যেমন সেইকপ অমুকফা তমুকফা নামে তাহারা পরিচিত দিলেন। পরে কঞ্চৌফা নামে এক ত্রিপুরার একটি পরমা স্তন্দরী কন্যা জন্মে। পিতৃগৃহেতে সেই কন্যা কালের গতিতে যুবতী হইল। সেই কন্যাটিকে বিবাহ দেওয়া হয় নাই এমতাবস্থায় সদাশিব এক রাত্রিতে পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া সেই কন্যাকে হরণ করিলেন এবং সেই কন্যার গর্ভ হইল। তখন কঞ্চৌফার জ্ঞাতি কুটুম্বগণ কঞ্চৌফাকে জিজ্ঞাসা করিল “তোর কন্যার গর্ভ কিরূপে হইল?” পরে সেই কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল “এক রাত্রিতে একজন পুরুষ আসিয়া আমাকে হরণ করিয়াছিল আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই।” তারপর সেই কন্যার পিতাকে স্বপ্নে সদাশিব বলিলেন, “আমি সদাশিব, আমার বীৰ্য্যে এই গর্ভ হইয়াছে, তুমি ইহাতে সন্দেহ করিও না। এই কন্যা হইতে এক পুত্র জন্মিবে এবং সে তোমাদের সকলের রাজা হইবে।” কালক্রমে সেই কন্যার এক পুত্র জন্মিল। কালের নিয়মে সেই বালক বড় হইল এবং মহাবলশালী হইল। পরে সে সমস্ত ত্রিপুরাগণকে তাহার অধীন করিয়া লইল। একদিন হরিণ শিকার করিতে গিয়া সে দেখিতে পাইল যে পর্বতের একটি গহ্বর আলোকিত হইয়া আছে। সে অলোক দেখিয়া কিসে ঐ আলো দিতেছে দেখিতে গেল। সেখানে গিয়া দেখিল যে একটা বেঙ একটা সাপকে ধরিয়াছে; সেই বেঙের মাথায় একটি মাণিক্য আছে এবং সেই মাণিক্য হইতে আলো বাহির হইতেছে। তখন সেই সাপটাকে

মারিল, পরে বেঙটাকে মারিয়া ঐ মাণিক্য লইয়া আসিল। সেই রাত্রিতে সদাশিব স্বপ্নে তাহাকে বলিলেন-- “এই মাণিক্য তুই গোঁড়ের বাদশাকে দিবি, ইহাতে তোর সকল কার্যসিদ্ধি হইবে।” তখন সে ঐ মাণিক্য নিয়া গোঁড়ের বাদশাকে দিল। গোঁড়ের বাদশা ঐ মাণিক্য পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ছত্র দণ্ড দিয়া তাঁহাকে রাজ্য করিয়া তাহার নাম রত্ন মাণিক্য রাখিলেন এবং বলিলেন “তোমার বংশে পরবর্তী কালে যে সকল রাজ্য হইবে তাহাদের সকলের নাম মাণিক্য রাখিও।” তারপর বাদশা আদর করিয়া রত্ন মাণিক্যের সঙ্গে ছত্রিশ জাতির লোক দিয়া তাঁহাকে নিজ দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

তারপর রত্ন মাণিক্য রাজ্য নিজ দেশে আসিয়া নগর স্থাপন করিলেন এবং সেই নগরের নাম উদয়পুর রাখিলেন। তারপর রাজ্য সদাশিবের অন্তঃপ্রস্থ স্বীকার করিয়া সোনার ত্রিশূল একটি এবং অর্দ্ধচন্দ্র একটি মোট দুইটি রাজচিহ্ন গড়াইলেন। রাজ্য বাহির হইলে এই দুইটি রাজ্যের আগে আগে লইয়া যাওয়া হইত। রাজ্য বসিবার জগু একটি সিংহাসন গড়াইয়া লইলেন। তারপর কিছুকাল স্বাধীন ভাবে রাজ্য ভোগ করিলেন। কালক্রমে রত্ন মাণিক্য রাজ্য পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র অমর মাণিক্য। অমর মাণিক্যের পুত্র জহোমাণিক্য, জহোমাণিক্যের পুত্র বিজয় মাণিক্য এবং বিজয় মাণিক্যের পুত্র কৈলাশ মাণিক্য। কৈলাশ মাণিক্যের দুই পুত্র জম্বিল, একজনের নাম গোবিন্দ মাণিক্য এবং অপর জনের নাম ছত্র মাণিক্য। গোবিন্দ মাণিক্য রাজ্য হইয়া তিন বৎসর রাজ্য করিলে পর তাহার ভাই ছত্র মাণিক্য মুসলমান নবাবের নিকট গিয়া প্রতি বৎসর দুইটি হাতী দেওয়ার ও বাংলার নবাবের নিকট জামিনদার থাকিবার সর্তে রাজ্য হইয়া মুসলমান নবাব হইতে লোকলঙ্কার আনিয়া গোবিন্দ মাণিক্যকে সরাইয়া দিয়া নিজে রাজ্য হইলেন। সেই দিন হইতে বাংলার নবাবকে হাতী দেওয়ার সর্ত হইল এবং রাজ্যবংশের লোকের মুসলমানের নিকট জামিনদার থাকিবার চুক্তি হইল। তারপর গোবিন্দ মাণিক্য রাজ্য লুকাইয়া লুকাইয়া নিজ ঘরে দুইবৎসর রহিলেন। ছত্র মাণিক্য রাজ্য হওয়ার পর

লোকের হুখ চুখের বিচার করিতেন না এবং গণ্যমাশ্র লোকদিগকে হতমান করিতেন। তখন সমস্ত বড়লোকগণ পরামর্শ করিয়া গোবিন্দ মাণিক্যের নিকট গিয়া বলিলেন, “ছত্র মাণিক্য সমস্ত দেশ উচ্ছন্ন করিল। পূর্বে কোনও দিন মুসলমান বাদশাকে হাতী দেওয়ার বা জামিনদার থাকিবার চুক্তি ছিল না। ছত্র মাণিক্য তাহাই করিল। তজ্জন্ত আমরা সকলে একমত হইয়া আপনাকে রাজা করিব।” এই কথা শুনিয়া গোবিন্দ মাণিক্য বলিলেন, “ভালই হইয়াছে, তোমরা যদি সকলে একমত হইয়া আমাকে রাজা কর তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে ভাল করিয়া সম্মান দিব।” তারপর ছত্র মাণিক্যকে বধ করিয়া গোবিন্দ মাণিক্য রাজা হইলেন। গোবিন্দ মাণিক্য রাজা হওয়ার কতক দিন পরে মুসলমান নবাবকে হাতী দেওয়া বন্ধ করিলেন। গোবিন্দ মাণিক্য অনেক দিন রাজত্ব করার পর মারা গেলেন।

তারপর গোবিন্দ মাণিক্যের পুত্র রাম মাণিক্য রাজা হইলেন। রাম মাণিক্য রাজা তাহার ভাই নরেন্দ্র মাণিক্যকে প্রতাপালন করিয়া সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। চম্পক রাই রাম মাণিক্য রাজার সম্পর্কে ছোট ভাই হইতেন। রাম মাণিক্য রাজা চম্পক রাইকে সকল গুণে যোগ্য দেখিয়া যুবরাজ করিলেন। পরে রাম মাণিক্য রাজার বিবাহিতা প্রধানা ভাষার গর্ভে রত্ন মাণিক্য জন্ম গ্রহণ করেন এবং অবিবাহিতা তিন ভাষার গর্ভে তিন পুত্র জন্মিল। একজনের নাম দুর্জয় সিংহ, একজনের নাম ঘনশ্যাম এবং অপর জনের নাম চন্দ্রমণি। এইরূপে রাম মাণিক্য রাজার চারি পুত্র জন্মিল। রাজা রাম মাণিক্য মারা যাওয়ার সময়ে রত্ন মাণিক্যের বয়স মাত্র সাত বৎসর ছিল। রাজা রাম মাণিক্য মারা যাওয়ার সময় যুবরাজ চম্পক রাইয়ের হাতে তদীয় রাজ্য সহিতে রত্ন মাণিক্যকে সমর্পণ করিলেন।

রাজা রাম মাণিক্য মারা যাওয়ার পর যুবরাজ চম্পক রাই সাত বৎসরের বালক রত্ন মাণিক্যকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজা করিলেন। রাজ্যের ব্যবসায় কাজ-কারবার সকলই চম্পক রাই নিজেই চালাইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন কাটিল। তারপর রাম মাণিক্য রাজার ভাই নরেন্দ্র

মাণিক্য মুসলমান নবাবের নিকট গিয়া বাদশাকে আরও দুইটি হাতী বাড়াইয়া দেওয়ার সর্তে এবং ঢাকার নবাবের জন্ত একটি হাতী দেওয়ার অঙ্গীকারে নবাবের লোক লঙ্কর আনিলেন। এই কথা শুনিয়া চম্পক রাই পলাইয়া ঢাকায় গেলেন।

রত্ন মাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নরেন্দ্র মাণিক্য রাজা হইলেন। নরেন্দ্র মাণিক্য রত্ন মাণিক্যকে সঙ্গে রাখিয়া ভালরূপে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র মাণিক্য রাজা হইয়া পূর্বের পাত্র, মন্ত্রী সকলকে ঈর্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজার সুখ-দুঃখের বিষয়ে ভাল করিয়া যত্ন লইলেন না। তারপবে সকলে যুক্তি করিয়া চম্পক রাইয়ের নিকটে গোপনে পত্র লিখিলেন যে, “নরেন্দ্র মাণিক্য রাজা হইয়া অত্যাচার নিয়ম-কানুন চালু করিয়াছেন; প্রজার সুখ-দুঃখের কথা ভাবিয়া দেখেন না। এই কারণে দেশ উচ্ছ্বসে যাইতেছে। আপনিও ঢাকাতে গিয়া নিশ্চিন্তে কাল কাটাই-তেছেন। অত্রাবস্থায় যাহাতে পূর্বের ন্যায় রত্ন মাণিক্যকে রাজা করিয়া এবং আপনিও যুবরাজের পদে থাকিয়া প্রজা-পালন করিতে পারেন তাহার উপায় চিন্তা করিয়া শীত্র চলিয়া আসিবেন এবং আমরাও আপনার সঙ্গে আছি এইকপ জানিবেন।” উক্তরূপে পত্র লিখিয়া তাহারা গোপনে পত্রটি চম্পক রাইয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। চম্পক রাই এই পত্র পাইয়া নবাবের লোক-লঙ্কর লইয়া দেশে আসিলেন। তখন নরেন্দ্র মাণিক্য রাজা নিজ দেশের লোক-লঙ্কর লইয়া গিয়া চণ্ডীগড়ে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। নরেন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গে তালেবর লোকেরা নরেন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া চম্পক রাইয়ের পক্ষে আসিলেন। নরেন্দ্র মাণিক্য রাজা পলায়ন করিয়া রাজধানীতে আসিলেন এবং নিজের স্ত্রী ও পরিজনকে ফেলিয়া এবং রত্ন মাণিক্যকে সম্ভাষণ করিয়া পলায়ন করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

যুবরাজ চম্পক রাইয়ের হত্যা

তারপর চম্পক রাই দেশে আসিয়া রত্ন মাণিকাকে রাজা করিলেন এবং নিজেও যুবরাজের পদে রহিলেন। পরে নরেন্দ্র মাণিকাকে খুঁজিয়া আনিয়া বধ করিলেন। তারপর চম্পক রাই সকলকে উপযুক্ত কপে সম্মান দিয়া প্রজাব নুখ-ছুখ বিবেচনা করিয়া এবং অনেক সিপাহী সঙ্গে বাখিয়া রত্ন মাণিক্য রাজার সেবা করিয়া কিছু দিন কাটাইলেন। চম্পক রাইয়ের ভাগিনা কাশীরামকে চম্পক রাই হাতিখেদার কাজের জ্ঞান সুবা নিযুক্ত করিলেন। পূর্বের নিয়মে রাজবংশীয় ভিন্ন অপব কেহ আবোয়ান লইতে পারিতেন না। চম্পক রাই কাশীরামকে আবোয়ান সঙ্গে লইবার অনুমতি দিলেন। ইহা বড়বড় লোকদের অসহ্য হইল। তাহারা সকলে পবামর্শ কবিষা একমত হইয়া রাজার অজ্ঞাতে রাজা ও চম্পক রাইয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জ্ঞান রাজাকে বলিলেন, “চম্পক রাই সমস্ত অধিকার করিয়াছে, আপনি কেবল নামে মাত্র রাজা। বর্তমানের হায়ে পূর্ব কখনও যুবরাজের হাতে কাজ-কারবার থাকিত না। মহারাজ পূর্ব বালক ছিলেন সেজ্ঞা সবকিছু যুব-রাজকে করিতে হইত। কিন্তু বর্তমানে মহারাজ সব কিছুই যোগ্য বটে। অত্ৰাবস্থায় রাজ্যের কাজকারবার মহারাজের হাতে আনা উচিত।” তাহারা এইকপ বলিলে রাজা কহিলেন, “চম্পক রাই সব কিছুই ভালরূপে ব্যবস্থা করিতেছে, ; তোমরা কেন এরূপ বলিতেছ?” তারপর তাহারা বারবার এরূপ বলাতে রাজা বলিলেন, “তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা হয়ত ঠিক, কিন্তু চম্পক রাইয়ের হাতে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও লোক-লস্কর আছে, এমতাবস্থায়

কি প্রকারে রাজ্যেব কাজকাববাব আমাদেব এখানে আনা যায় ?” তখন তাহাবা বলিল, “মহাবাজ্ঞ আদেশ দিলে চম্পক বাই সমস্তই দিয়া দিবে।”

তাবপর মহাবাজ্ঞ তাহাদেব কথামত চম্পক বাইকে বলিয়া পাঠাইলেন, “রাজ্যেব যাবতীয কাজকাববাব আমাব এখানে হইবে।” বাজ্ঞাব আদেশ শুনিযা চম্পক বাই সকল বিষয়ই বাজ্ঞাব নিকট দিয়া দিলেন। তাবপর চম্পক বাই সশযাপন্ন হইয়া বাজ্ঞসভায় আসা বন্ধ কবিলেন। বাজ্ঞা চম্পক বাই কেন বজ্ঞদববাবে আসেন না তাহা জানিতে চাহিয়া চম্পক বাইযেব নিকট লোক পাঠাইলেন। ইহাতে চম্পক বাই বলিলেন, “হুজ্জন সকলে মহাবাজ্ঞেব সঙ্গে আমাব ভেদ সৃষ্টি কবিযাছে, সেজন্তু দ্বিধাগ্রস্থ হইয়া আশ্রি সেখানে যাইতেছি না।” চম্পক বাই যে সন্দেহ বশতঃ রাজ্ঞাব নিকটে আসেন না একথা অগ্গায়েবা উলটা কবিযা বাজ্ঞাকে বুঝাইল। তাহাবা বলিল, “চম্পক বাই মহাবাজ্ঞাব সঙ্গে লড়িতে চায় বলিয়া মনে হয়, এক্ষণে অমণ যদি পুৰ্বেই তাহাকে আত্রমণ কবি তাব কেনন হয় ?” বাজ্ঞাব চিন্তে চম্পক বাইযেব জন্তু মায়া ছিল। তাহাবা এইকপ বলিলেও রাজ্ঞা কিছুই বলিলেন না। চম্পক বাই এই কথা শুনিযা বাজ্ঞাব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিতো মনস্থ ববিলেন। তখন চম্পক বাইযেব ভাগিনা কাশীবাম চম্পক বাইকে ডাকিয়া বলিল, “তুমি সেখানে যাইও না, সেখানে গেলে বিপদ ঘটবে।” ইহাতে চম্পক বাই উত্তব দিলেন, “আমি স্বপ্নেও বাজ্ঞাব অনিষ্ট চিন্তা কবি নাই, আমাব কেন বিপদ হইবে।” তখন কাশীবাম বলিল, “তুমি অনিষ্ট আচরণ কব নাই সত্য এবং বাজ্ঞাবও তোমাব প্রতি বিদ্বেষ ভাব ছিল না, কিন্তু ছুটগণ বাজ্ঞাব নিকট কান কথা বলিয়া বাজ্ঞাব মনে তোমাব প্রতি শত্রুভাব সৃষ্টি কবিযাছে, এক্ষণে বাজ্ঞা ঐ ছুটগণেব কথা এড়াইতে না পাবিযা পাছে কিছু অনিষ্ট কবে এক্ষণই আমি তোমাকে বাধা দিলাম।”

তারপর চম্পক বাই নিজ হুর্গেব ভিতরে সিপাহী চাকব লইয়া এবং বড় বড় কামান পাতিযা সাবধানে বহিলেন। এইকপে তিনদিন কাটিল। কাশীবাম ছিল সিপাহীদেব সর্দাব, তার ভয়ে চম্পক বাইযেব হুর্গের দিকে

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাজার দৈনিক কাজ

রাজা প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া করার পর দস্ত ধাবন করেন। তারপরে মালিশওয়ালা রাজার শরীরে তৈল মালিশ করিলে রাজা নদীর জলে স্নান করিয়া সোনার ঘটিতে করিয়া এক ঘটি গঙ্গাজল মাথায় ঢালেন। রাজার আদেশের বলে এই গঙ্গাজল মাসে একবার নৌকায় করিয়া আনাইতে হইত। তারপর রাজা মন্দিরে গিয়া ইষ্ট-দেবতার সেবা-পূজা করেন। সেখান হইতে আসিয়া জলপান করিয়া পূবাণপাঠ শুনে। তারপরে ভোজন করিয়া বসন পরিধান করেন। সেই সময়ে বাজার সেবক ডাকিয়া বলে—“মহারাজের বাহির হইবার সময় হইল।” সঙ্গে সঙ্গে সেলামবাড়ি বাজে। তখন যুবরাজ ইত্যাদি বড় বড় লোকেরা দরবারে উপস্থিত হন। রাজ সভাপণ্ডিত, ইত্যাদি দরবারী লোকেরাও আসে। তারপর দেড় প্রহর অতিক্রান্ত হইলে রাজা আসিয়া সেই সিংহাসন-ঘবে সিংহাসনের উপরে বসেন। যুবরাজ সেই সিংহাসন-ঘরে আসিয়া রাজাকে প্রণাম করেন। সেই ঘরে গালিচার উপরে একটি সূজনী পাতা থাকে যুবরাজ আসিয়া তাহাতে বসেন। বড়ঠাকুরের জঘ ঐ গালিচার উপরে একখণ্ড কাপড় পাতা থাকে, বড়ঠাকুর আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া উহাতে বসেন। ছুইজন সভাপণ্ডিত আসিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া এইকপে বসেন। রাজ পুরোহিতও আসিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া গালিচার উপরে বসেন। উজীর, নাজীর, নেমুজীর, কার্কোন, কতোয়াল মুখিব ও দেওয়ান আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া ঐ ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকেন। এই ঘরের দিকে আসিবার সময় উপরোক্ত ব্যক্তিগণ মধ্যে কেহই অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে লইতে পারেন না।

দেশের অগ্রাগ্র বড়লোকেরা তাহাদের লোকজন লইয়া এবং বাংলাদেশ হইতে আসিয়া যাহারা চাকুরী করিতেছে তাহারা রাজাকে প্রণাম করিয়া ঐ ঘরের সম্মুখের খোলা জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকে। সেই খোলা জায়গায় সোনার লাঠি লইয়া দুইজন এবং কপার লাঠি লইয়া দুইজন— এই চারিজন লোক দাঁড়াইয়া থাকে। তাহাদিগকে গুরু-জবদদার বলে। দেশ বিদেশের লোক রাজাকে প্রণাম করিতে আসিলে তাহাও গুরু জবদদারদের রাজার কর্ণগোচর করিতে হয়। রাজা এইকপে দুই দণ্ডকাল বসিয়া থাকেন। যে সমস্ত বিষয়ে আলোচ্য করিবাব থাকে তাহা এই সময়ে হয়। তারপর একজন সেবক রাজবাড়ির ভিতর হইতে ফুল-চন্দন, সুগন্ধযুক্ত পান ও সুপারি আনিয়া দেয়। একজন ব্রাহ্মণ, যুবরাজ প্রভৃতি সকলকে নিয়মিত কপে পান-সুপারি ইত্যাদি বিতরণ কবে। তাবপব সকলে এই ঘর হইতে নামিয়া আসিয়া সম্মুখের খোলা জায়গায় রাজাকে প্রণাম করে। ব্রাহ্মণেরা রাজাকে আশীর্ব্বাদ কবে। তাবপব রাজা উঠিয়া রাজবাড়ির ভিতরে যান এবং অগ্রাগ্রেরা নিজ নিজ বাড়ীতে যায়। পালাক্রমে একজন বড়য়া সোনার ছায়াবী ঘরে এবং একজন হাজাবি অনুমান ৪০ জন লোক লইয়া কপার ছায়ারী ঘরে থাকে। তাহারা রাত্রিতেও এই নিয়মে পাহারা দেয়। উপবোধ নিয়মে প্রতিদিন কার্য্য চলে।

চতুর্দশ অধ্যায়

নিজে রাজা হওয়ার জন্য ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের
প্রচার ও ষড়যন্ত্র

এইকপে রত্ন মাণিক্য রাজা নিজ ধর্ম্মাহুসারে কিছুকাল প্রজা পালন করিতে লাগিলেন ; প্রজাগণও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। একদা কবিশেখর নামে এক কাষেস্ত্রের ভগিনীকে রাজা রত্ন মাণিক্য রাণী করিয়া আনিলেন। রাজা এই মহিলার মায়ায় কবিশেখরকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাকে ঘন ঘন পুরস্কার আদি দিতে লাগিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিতে লাগিলেন যে রাজার ভাণ্ডারের সমস্ত কিছুই কবিশেখর নারায়ণ নিয়া শেষ করিয়াছে। কবিশেখর রাজার আদরে পর্ব্বিত হইয়া একদিন রাজার ভাই ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরকে “বান্দীর পুত” বলিয়া গালাগালি দিলেন।

বড়ঠাকুর এই কথা শুনিয়া দুই দিন পরে রাজবাড়িতে গিয়া ছয়ারীকে (স্ট্রীলোক আরক্ষিক) এই বলিয়া রাজাকে জানাইয়া পাঠাইলেন যে “আমি রাম মাণিক্য রাজার পুত্র এবং রত্ন মাণিক্য রাজার ভাই। কবিশেখর আমাকে ‘বান্দীর পুত’ বলিয়াছে। তুমি এই কথা গিয়া রাজাকে জানাও যে আমি কবিশেখরকে কাটিতে বাইতেছি।” ছয়ারী রাজার সেবকের মারফতে এই কথা রাজাকে জানাইলে রত্ন মাণিক্য লোক পাঠাইয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন যে “কবিশেখর এইরূপ বলিতে পারে না, আমি তাহাকে শাস্তি দিব, তোমরা গিয়া বড়ঠাকুরকে অপেক্ষা করিতে বল।” সেই লোকেরা আসিয়া দেখে যে বড়ঠাকুর চলিয়া গিয়াছে। ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর ছয়ারীকে খবর

দিয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া কবিশেখরের বাড়ীতে গেলেন। কবিশেখর নিজ চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পূজা করিতে ছিলেন। সেই সময় ঘনশ্যাম চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে ঢুকিয়া কবিশেখরকে কাটিয়া ফেলিলেন। রাজা তাড়াতাড়ি করিয়া ঘনশ্যামের পিছনে পিছনে লোক পাঠাইয়া দিলেন। বড়ঠাকুর কবিশেখরকে কাটিয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে তাহারাতাহার দেখা পাইল।

তাবপব কবিশেখর নাবায়ণেব ভাইযেব বংশীযেরা তাহার মৃতদেহ রাজবাড়ীর দবজায় রাখিয়া রাজার নিকট নালিশ করিয়া বলিল যে বিনা অপবাধে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর কবিশেখরকে হত্যা করিয়াছে। রাজার স্ত্রী কবিশেখর নারায়ণের ভগিনীও অনেক কাদিয়া রাজাকে বলিল, “তুমি বিগ্ৰহমান থাকিতে বিনা দোষে বড়ঠাকুর আমার ভাইকে কেমনে বধ করেন?” তখন রাজা বলিলেন “ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর আমার ভাই হয়, তাহাকে কেন কবিশেখর অগ্নায় কথা বলিল? এই কাজেব জগ্গ বড়ঠাকুরকে শাস্তি দিলেও দিতে পারি কিন্তু তাহা করিলে লোক সমাজে আমার ছুঁনাম হইবে, তাহাছাড়া তোমার ভাইকেও ফিবিয়া পাওয়া হাইবে না।” এই কথা বলিয়া রাজা নিজের স্ত্রীকে প্রবোধ দিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বড়ঠাকুর রাজার স্ত্রীর ভাই কবিশেখরকে বধ করিয়া মনে মনে রাজার প্রতি সংশয়াবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

রত্ন মাণিক্য রাজার এক সহোদরা ভগ্নী ছিলেন; তাহাকে রাজা রাজতুল্লভ নামক এক ত্রিপুরার নিকট বিবাহ দিয়াছিলেন। পরে রাজা ঐ ভগ্নীর প্রতি স্নেহ-পরবশ হইয়া রাজতুল্লভ নারাণকে কোতোয়াল মুছিবের পদ দিলেন এবং তাহাকে আরোয়ান ও নিশান দিলেন। ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর রাজার এই কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন যে “কোনও দিনও কোনও রাজা কোতোয়াল মুছিবকে আরোয়ান ও নিশান দেন নাই, রত্ন মাণিক্য রাজা এইরূপ অনিয়মের কাজ করিতেছে।” এই কথা ঘনশ্যাম মনে করিয়া রাখিলেন। এদিকে রত্ন মাণিক্য রাজা কোনও কথা মনে করিয়া

রাখিলেন না এবং ঘনশ্যামকে পূর্বের ছায় স্নেহমমতা করিতে লাগিলেন।

মুরাদবেগ নামে এক মোগল ছিল। মুরাদবেগের পিতাকে দিয়া চট্টগ্রাম লুণ্ঠন করিয়া আনা হইয়াছিল এবং তাহাকে অত্যন্ত উপযুক্ত দেখিয়া রাজা সম্মান দিয়া নিজের সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। মুরাদবেগের পিতা মারা যাওয়ার পর রত্ন মাণিক্য রাজাও পূর্বের ছায় মুরাদবেগকেও সেইরূপ সঙ্গে রাখিলেন। মুরাদবেগ কর্মী হিসাবে চাকরি লইয়া রাজার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তাহার ঘর বাড়ি মেহেবকুল পরগনায়, পরিজনবর্গ সেখানেই থাকে। তাহাছাড়া রাজার আবশ্যক মতে কাজ কর্তব্য করিতে ঢাকাতেও আসাযাওয়া করে; সে জন্ত মুরাদবেগ ঢাকাতেও একটি বাড়ি করিয়াছে।

মুরাদবেগের এক ভগ্নী মেহেবকুল পরগনার বাড়ীতে থাকে। সুন্দরী কন্যা আছে শুনিয়া রাজা মুরাদবেগকে না জানাইয়া সেই কন্যা আনিবার জন্ত গোপনে একজন সেবক পাঠাইয়া দিলেন। সেবক ঐ কন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া রাজার আদেশ জানাইল এবং বলিল, “তোমাকে লইয়া যাইবার জন্ত মহারাজের আদেশ হইয়াছে, তোমাকে যাঁহাতে হইবে।” এই কথা শুনিয়া সেই কন্যা বলিল, “ভাল হইয়াছে, মহাবাজ যখন আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, আমি যাইব। তুমি দিন চাৰি অপেক্ষা কর; আমি জিনিসপত্র কিছু গুছাইয়া লই।” এইরূপে তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গোপনে মুরাদবেগের নিকট খবর পাঠাইয়া জানাইল যে “আমাকে পূর্বের ঢাকার এক মোগলের নিকট বিবাহ দিগছ; এদিকে আমাকে লইয়া যাইবার জন্ত রাজার একজন সেবক আসিয়াছে। রাজা যদি আমাকে লইয়া যায় তবে ঐ মোগলের নিকট তোমার অপযশ হইবে। এই বিষয় জানিয়া যাহা উচিত মনে হয় কর।”

মুরাদবেগ এই পত্র পাঠ করিয়া চুঃখিত হইয়া গোপনে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের নিকট সমস্ত কথা জানাইল। এই কথা শুনিয়া ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর মনে মনে ভাবিলেন, এই সুযোগে আমি মুরাদবেগের সঙ্গে রাজার বিবাদ ঘটাইব এবং ইহাতে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া

মুরাদবেগকে বলিলেন, “রাজার সঙ্গে কি তোমার পূর্বে এবিষয়ে কোন কথাবার্তা হইয়াছে ? এখন তুমি ভাবিয়া দেখ যে রাজার এই কাজ তুমি ভাল মনে কর কি না ?” মুরাদবেগ বলিল, “এবিষয়ে রাজার সঙ্গে আমার পূর্বে কোনও কথাবার্তা হয় নাই, আমি ইহার কিছুই জানি না। তাহা ছাড়া পূর্বেই এই কথা আমি ঢাকায় এক মোগলের নিকট বিবাহ দিয়াছি, এখন রাজা যদি এই কথা লইয়া আসেন তবে আমি ঐ মোগলের নিকট কি উত্তর দিব ? আর সেই মোগলই বা কেন আমাকে ছাড়িয়া দিবে ? তাহা ছাড়া পূর্ব অবধি আমাদের মেয়ে রাজারা কখনও নেন নাই। বর্তমানে রাজা এইরূপ অনিয়মে চলিলে আমি কি বলিব ! আর কিকপেই বা এ বিপদ হইতে রক্ষা পাইব ?” মুরাদবেগের উত্তর আশাঞ্জনক দেখিয়া ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন, “তুমি যাহা বলিবাছ, ভালই বলিয়াছ। যদি তুমি তোমার ভগ্নীকে রাখিতে ইচ্ছা কর তবে এখনই তোমার মেহেরকুলের বাড়ীতে গিয়া তোমার স্ত্রী ও পরিবারবর্গের লোকজন লইয়া ঢাকায় চলিয়া যাও, তবে তোমার সবদিক রক্ষা হইবে।” তখন মুরাদবেগ ঢাকায় চলিয়া যাইবে বলিয়া স্থির করিয়া ঘনশ্যাম ঠাকুরকে বলিল, “আমার ছাড়পত্র নাই, চণ্ডীগড়ের সিপাহীরা আমাকে কেন ছাড়িয়া দিবে ?” ঘনশ্যাম বলিলেন, “তোমাকে কে আটকাইতে পারে ? তুমি নিজ ক্ষমতা দেখাইয়া চলিয়া যাইও।” তারপর মুরাদবেগ নৌকা লইয়া রাজধানী হইতে মেহেরকুলের দিকে রওনা হইল।

মুরাদবেগের চলিয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া রাজা ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, “তুমি নিজে গিয়া মুরাদবেগকে বুঝাইয়া ফিরাইয়া লইয়া আইস।” এই কথা বলিয়া রাজা তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। ঘনশ্যামের মনে যে নিজে রাজা হওয়াব হুঁশা আছে তাহা রাজা জানিতেন না। তখন ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন, “উত্তম, আমি মুরাদবেগকে ফিরাইয়া আনিব, মহারাজ এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও চিন্তিত হইবেন না।” রাজার নিকটে এই কথা বলিয়া ঘনশ্যাম মুরাদবেগকে ফিরাইয়া আনিষ্টে

গেলেন। ঘনশ্যাম যাইয়া চণ্ডীগড়ের উজ্জানে মুরাদবেগের লাগ পাইলেন। তখন ঘনশ্যাম বলিলেন “তোমাকে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্ত রাজা আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন ; তোমার আমার মধ্যে যে গোপন কথা হইয়াছে রাজা তাহার কিছুই জানেন না। এখন আমার মনের কথা তোমাকে এবং তোমার মনের কথা আমাকে বলা দরকার, তাহা ছাড়া আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয় সে বিষয়েও ব্যবস্থা করা উচিত।” তখন মুরাদবেগ বলিল, “সাহেব যাহা আদেশ করেন আমি তাহাই করিব।” তখন তামা-তুলসী সম্মুখে রাখিয়া শপথ করিয়া ঘনশ্যাম বলিলেন, “আমি তোমাকে ছাড়িব না এবং তুমিও আমাকে ছাড়িতে পারিবে না। যদি আমাদের এই শপথ ভঙ্গ হয় তবে খোদা ও পরমেশ্বর আমাদের শাস্তি দিবেন।” এইরূপে স্বীকৃত হইয়া উভয়ে শপথ গ্রহণ করিল। তখন ঘনশ্যাম মুরাদবেগকে বলিলেন, “আমাদের রাজা কোতোয়াল মুছিবকে আরোয়ান ও নিশান দিয়াছেন। তাহাছাড়া কবিশেখরকে দেওয়ান করিয়া বড় করিয়া দিয়াছিলেন, কবিশেখর আমাদের কাহারকেও মাগু করিতেন না। এখন আবার তোমার পরিবারের উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এইরূপ অনিয়ম কে সহ্য করে? তুমি আমার সহায় হও, আমি রাজা হই।” মুরাদবেগ বলিল “ভালই হইয়াছে, আপনি যাহা আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব। আপনার জন্ত আমার দেহ ও প্রাণ দিয়া আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব।” ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন “তুমি আর বিলম্ব করিও না। তোমার স্ত্রী ও পরিবারের লোকজনদের লইয়া শীঘ্র ঢাকাতে চলিয়া যাও। রাজা তোমাকে পাইলে মারিয়া ফেলিবে। তুমি ঢাকায় গিয়া সিপাহী ও চাকর যাহা পার সংগ্রহ করিয়া রাখ। আমি এখন হইতে হাতী খরিবার জন্ত যাইব। সেই সময়ে আগের দিনের নিয়মের চেয়ে দেশের লোকজন বেশী করিয়া আমার সঙ্গে লইয়া আসিব। পরে তোমার নিকট আমি লোক পাঠাইয়া দিব। তখন তুমি সিপাহী ও চাকর লইয়া আসিয়া আমার সঙ্গে মিলিত হইও। এখন তুমি চলিয়া যাও, আমি পিয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তোমার

দেখা পাইলাম না বলিয়া আমি রাজার নিকট বলিব।” তখন মুরাদ্বেগ বলিল, “রাজার একজন সেবক আমার বাড়ীতে গিয়াছে ; তাহার কি ব্যবস্থা করিব ?” ঘনশ্যাম বলিলেন, তুমি তাহাকে কাটিয়া ফেলিও।” মুরাদ্বেগ বলিল, “তাহা হইলে আপনার একজন লোক আমার সঙ্গে দিন।” তখন ঘনশ্যাম নিজের একজন বিশ্বাসী লোক মুরাদ্বেগের সঙ্গে দিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। মুরাদ্বেগ তাহার মেহেরকুলের বাড়ীতে গিয়া রাজার সেবকটিকে কাটিয়া ফেলিল এবং পরিবারবর্গ লইয়া নৌকায় উঠিয়া ঢাকায় চলিয়া গেল। রাজার সেবককে কাটিবাব জ্ঞাত ঘনশ্যাম ঠাকুর যে লোক দিয়াছিলেন মুরাদ্বেগ তাহাকেও সঙ্গে করিয়া ঢাকায় লইয়া গেল।

ঘনশ্যাম এইরূপে মুরাদ্বেগকে পাঠাইয়া দিয়া নিজের সঙ্গে লোক-দিগকে বলিলেন, “মুরাদ্বেগের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কথা কেহ বলিও না। যাহার মুখে এই কথা প্রকাশ পায় তাহাকে আমি কাটিয়া ফেলিব।” তারপর ঘনশ্যাম রাজধানীতে আসিয়া রাজাকে বলিলেন, “আমি মুরাদ্বেগের নাগাল পাইলাম না। সে পূর্বেরই চলিয়া গিয়াছে। গিয়াই বা সে আমাদের কি করিতে পারে ! কোনও অস্ত্রবিধার জ্ঞান বোধ হয় সে চলিয়া গিয়াছে। পুনর্ব্বার আমি তাহাকে আনাইলে সে আসিবে। বিশেষতঃ সে আমাদের কিছুই করিতে পারে না।” এইরূপে রাজাকে ছলনা করিয়া প্রবোধ দিয়া ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর ‘নিজ বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন। ঘনশ্যামের ছুরভিসন্ধির কথা রাজা জানিতে পারিলেন না।

গঞ্চদশ অধ্যায়

ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের হাতী ধরিতে যাত্রা

এইরূপে কিছুদিন কাটিল। তাহাদের দেশে প্রতি বৎসর হাতী ধরিবার জন্ত বড়ঠাকুরকে যাইতে হয়, তখন বড়ঠাকুরের সঙ্গে অনেক লোক যায়। হাতী-ধরার জায়গায় তিন চারি মাস থাকিয়া একশত বা আশিটি হাতী যাহা পাওয়া যায় ধরিয়া আনে। এই হাতীর মধ্যে কিছু নবাবকে ইরশাল দেয় এবং কিছু বিক্রয়ও করে। তাহাছাড়া দেশ বিদেশেও দেওয়া হইত এবং কিছু অবশিষ্টও থাকিত।

তারপর হাতী ধরার নিয়মিত সময় উপস্থিত হইলে রাজা বলিলেন, “বড়ঠাকুরের হাতী ধরিতে যাওয়ার সময় আসিয়াছে। দিন তারিখ দেখিয়া বড়ঠাকুর হাতী ধরিতে যাইতে প্রস্তুত হউক এবং সঙ্গে যেন যেন লোক নিতে হইবে তাহাদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্ত খবর দিক।” তখন রাজার আদেশ শুনিয়া ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন, “মহারাজের যখন আদেশ হইয়াছে তখন আমি হাতী ধরিতে যাওয়ার জন্ত প্রস্তুত হইব। কিন্তু পূর্বে মুসলমান নবাবকে দুইটি হাতী দেওয়ার সর্ত ছিল; তারপর নরেন্দ্র মাণিক্য আরও দুইটি বাড়াইয়া দিলেন। চম্পক রাই অহঙ্কারে মত্ত থাকিয়া ঐ বর্ধিত হাতীগুলি দেন নাই। বর্তমানে ঐ বাকীপড়া হাতীর জন্ত মুসলমান নবাব বার বার মহারাজকে জানাইয়া পাঠাইয়াছে। যদি এড়াইতে না পারা যায় তবে সেই হাতীও দিতে হইবে। এই কারণে এ বৎসর বেশী করিয়া হাতী-ধরা দরকার এবং সেজন্ত বেশী করিয়া লোকও লইয়া যাইতে হইবে।”

ঘনশ্যাম এইকপ বলিলে পৰ বাজা বলিলেন, “বড়ঠাকুৰ ভালই বলিযাছে, পূবেৰ চেয়ে অতিবিক্ত যতলোক লাগিবে বড়ঠাকুৰ সংগ্ৰহ কৰিয়া লইয়া পৰে আমাকে জানাইবে।” তাৰপৰ ঘনশ্যাম অন্তৰাবৰ চেয়ে বেশী কৰিয়া বড়লাক ও অন্তান্ত লোক যাহা আবশ্যক মনে কৰিলেন সঙ্গ কৰিয়া লইলেন এবং পৰে বাজাকে গিয়া অতিবিক্ত লোক যাহা লওয়া হইয়াছে জানাইলেন। বাজা তাহাৰ কায্য অনুমোদন কৰিয়া তাহাকে পুৰস্কাৰ দিয়া বিদায় দিলেন। বড়ঠাকুৰ বস্ত্ৰ মাণিক্য বাজৰ নিকট হইতে বিদায় লইয়া সেই সমস্ত লোকজন সঙ্গ কৰিয়া অগ্ৰহাষণ মাসে তাৰী ধৰিতে বনো হইয়া খণ্ডল পৰগণায় গিয়া বাস কৰা বহিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

ত্রিপুরার দরবারে আসামের দূত

এদিকে স্বর্গদেবতার আদেশে আমরা দূতগণ চৈত্র মাসে ত্রিপুরাব রাজধানীতে পৌঁছলাম। রাজা রত্ন মাণিক্য আমাদের জ্ঞাত্য থাকা ও খাওয়ার যোগাড় করিয়া দিয়া আমাদের রাখিলেন। পবে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, “আজ চারি মাস হয় বড়ঠাকুর হাতী ধরিতে গিয়াছে; এই কার্যো লোকজন ও দেশের বড় লোকেরা বেশী কথিয়া চলিয়া গিয়াছে।” আমাদের এখানে স্বর্গদেব রাজার দূত আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদিগকে রাজসভায় অভ্যর্থনা করা দরকার। বড় রাজ্যাব নিকট হইতে দূত আসিয়াছে, অতএব বৃহৎ সভা করিয়া সেই দূতগণকে দরবারে অভ্যর্থনা করা উচিত। এই কথা জানিয়া বড়ঠাকুর সন্তুষ্ট চলিয়া আসুক।” রাজার এই পত্র পাইয়া বড়ঠাকুর রাজার নিকট ছল করিয়া এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন তাহাতে তিনি বলিলেন, “মহারাজ উত্তম আদেশ দিয়াছেন, কিন্তু বহুদিনের চেষ্টায় হাতী ধরা হইয়াছে, আর কিছু ধরিবার বাকী আছে; ঐগুলি না ধরা উচিত হয় না। রাজধানীতে দেশের লোকজন জড় করিয়া সুন্দররূপে দরবার করিয়া স্বর্গ রাজার দূতগণকে দরবারে অভ্যর্থনা করা হউক। পরে তাহাদিগকে বিদায় দিবার সময়ে মহারাজা আমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল মনে হয় সেরূপ করিবেন।” রাজা এই পত্র পাইয়া ঘনশ্যাম আসিবে না জানিয়া আমাদের রাজসভায় অভ্যর্থনা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

রত্ন মাণিক্য রাজ্য যুবরাজ ও উজীরকে আদেশ করিলেন, “বড় রাজ্যের দূত আসিয়াছে, তাহাদিগকে দরবারে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত দিন তারিখ দেখিয়া রাজধানীর লোকজন জড় করিয়া জিনিসপত্র হুন্দররূপে গুছাইয়া ভাল করিয়া দরবারের ব্যবস্থা করুক।” যুবরাজ ও উজীর রাজ্যের আদেশ শুনিয়া দিন তারিখ দেখিয়া বৈশাখ মাসের চার দিন গত হইলে আমাদিগকে দরবারে উপস্থিত করার দিন স্থির করিলেন। দরবারের দিন অনুমান ষাট জন ঘোড়সওয়ার দরবাবে আসিল। তাহারা বিদেশ হইতে আসিয়া এরাঙ্গো চাকরিতে ভরতি হইয়াছে। ইহাদের পরনে ছিল জামা, ইজার এবং জামিয়ার এবং ইহাদের অস্ত্র ছিল ঢাল, তরোয়াল, তীব এবং ধনুক; তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহাবও হাতে বড়শিও ছিল। তাহাদের ঘোড়াগুলির জিন কতক ছিল চামড়াব আব কতক ছিল বনাতোব। তাহারা মাসিক হিসাবে রূপার টাকাষ মাতিযানা পায়। ঢালীব সংখ্যা অনুমান এক হাজারের মতন হইবে। ইহাদের অস্ত্র ছিল ঢাল এবং তরোয়াল। তীরন্দাজ ছিল অনুমান দেড় হাজার; ইহাদের অস্ত্র ছিল ঢাল, তীর এবং ধনুক। হিন্দুস্থানী সৈন্যের সংখ্যা অনুমান পাঁচশত; ইহাদের অস্ত্র ছিল বন্দুক, ঢাল এবং তরোয়াল। এই সমস্ত সৈন্যদের মধ্যে জমাদার ও হাজারি এই দুই পদের লোক আছে। তাহাদের মাসিক বেতনের টাকা এই দুই পদের লোকদের হাতে দেওয়া হয়; তাহারা অগ্ন্যস্ত্রদের ঐ টাকা বাঁটিয়া দেয়। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের সভায় উপস্থিত হইবার পূর্বেই ঐ সমস্ত লোকের সংখ্যা তিন হাজারের মতন হইয়াছিল।

আমাদের দুই জনকে নেওয়াব জন্ত ত্রিপুরার দুইজন দূত রামেশ্বর জায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য ও উদয় নারায়ণ বিশ্বাস ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদের এখানে আসিলেন। আমাদের জন্তও দুইটি ঘোড়া আনা হইল। ত্রিপুরার এই দুইজন দূতের সঙ্গে তীর-ধনুক-ধারী অনুমান চল্লিশ জন লোক আসিল। তাহারা আমাদের দুইজনকে আমাদের বাসা হইতে আনিয়া গড়ের বাহিরে রূপার ছয়দারী ঘরের সম্মুখে একটি কুঁজী ঘরে বসাইলেন। সেখানে রামেশ্বর

শ্রায়ালঙ্কার আমাদের সঙ্গে রহিলেন আর উদয় নাবায়ণ রাজার কাছে চলিয়া আসিলেন।

তখন যুবরাজ দরবারে আসিলেন। তাহার সঙ্গে আসিল লাল নিশান আর্টটি, ঘোড়সওয়ার ছয় জন, হিন্দুস্থানী সৈন্য, ঢালী, তীরন্দাজ ইত্যাদি লোক অসংখ্য এক শ জন। যুবরাজ পালকিতে চড়িয়া দরবারে আসিলেন। ঐ পালকির চাল ছিল বনাত দিয়া ঢাকা। সেই চালের দুই মাথায় দুইটি রূপাব কলাফুল দেওয়া ছিল। পালকির গা বনাত দিয়া মুড়িয়া দেওয়া ছিল এবং উহাব দুই মাথায় কপা দিয়া বাঘের মুখ বানাইয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যুবরাজের পরনে ছিল কিংখাবের জামা, সোনালী পটুকা, সোনালী কাজকরা গুজরাটী জিবা, এলাছার ইজার, ঘাড়ের উপর একখানি শাল কাপড়, কানে মুক্তা, গলায় দুগ্‌দুগীর সহিত মুক্তার মালা এবং কোমবে পাথর-খচিত হাতলযুক্ত একখানি খঞ্জর। তাহার দুই দিকে দুই জন সেবক সোনার হাতলযুক্ত দুইখানি তলোয়াব এবং সোনার চোখ লাগান ঢাল দুইটি লইয়া আসিতেছিল। তাহার আগে আগে আসিতেছিল দশটি হাতী, তার মধো দুইটির উপবে বনাত দেওয়া ছিল। হাতীগুলির দাঁতে সোনার বলয় ছয় জোড়া কবিয়া দিয়াছিল। উহাদের কপালে সোনার গোলাকৃতি গহনা পরানো ছিল। এই সমস্ত ছাড়া যুবরাজের চড়িবার তুর্কী ঘোড়া ছিল একটি ; উহার জিন ছিল বনাতের তৈরী এবং মুখছাউনিটি ছিল সোনালী রংয়ের। চামড়ার তৈরী জিন লাগান টাঙ্গন ঘোড়া ছিল বারটি। এই সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম লইয়া যুবরাজ আসিলেন। এই সময়ে একজন লোক যুবরাজকে চামড় ঢুলাইতেছিল এবং অপর একজন যুবরাজের উপরে আরোয়ান ধরিয়া রাখিতেছিল। তারপর আসিলেন রাজবংশীয় ধরনীধর ঠাকুর। তাহার সঙ্গে ছিল সবুজ রংয়ের নিশান দুইটি, হাতী দুইটি, চামড়ার জিন লাগান ঘোড়া তিনটি এবং বনাতের তৈরী জিন লাগান ঘোড়া একটি। ঢালী ও হিন্দুস্থানী সৈন্য সহ তাহার সঙ্গে চল্লিশ জন লোক ছিল। ধরনীধর ঠাকুরও আসিলেন বনাতের

ছাউনি দেওয়া পালকিতে চড়িয়া। তাহার পরনে ছিল মখমলের জামা, গুজরাটী সোনালী কাজকরা জিরা, সোনালী পটুকা, আতলকের ইজার এবং একখানা শাল কাপড়। তাহার কানে মুক্তা, গলায় হুগ্‌হুগীর সঙ্গে মুক্তার মালা এবং কোমরে সোনালী রংয়ের জামিয়ার ছিল। সোনার গিলটি করা তলোয়ার একটি এবং ঢাল একটি সেবকের হাতে ছিল। তাহাদের দেশে রাজবংশীয় লোকদিগকে ঠাকুর বলে।

তারপর উজ্জীর আসিলেন। তাহার সঙ্গে হাতী ছিল ছয়টি, বনাতের জিন দেওয়া ঘোড়া একটি, চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া পাঁচটি; ঘোড়-সওয়ার তিন জন এবং ঢালী, হিন্দুস্থানী ও তীরন্দাজ সৈন্য মিলিয়া প্রায় আশি জন লোক তাহার সঙ্গে আসিল। বনাতের ছাউনি দেওয়া পালকিতে চড়িয়া উজ্জীর আসিলেন। সেই পালকির দণ্ডটি ছিল মখমল দিয়া মোড়ান। উজ্জীরের পরনে ছিল খাছাব জামা, সোনালী পটুকা, জিরা, গোছপেছ, আতলকের ইজার, শাল কাপড় একখানা এবং কোমরে সোনালী রংয়ের জামিয়ার। তিনি কানে মুক্তা এবং গলায় হুগ্‌হুগীর সঙ্গে মুক্তার মালা পরিধান করিয়াছিলেন। পালকির দুই ধারে দুই জন সেবক লইয়া চলিয়াছিল ঢাল দুইটি এবং সোনার হাতলযুক্ত ও বনাতের তৈরী খাপের মধ্যে তলোয়ার দুইটি। এইরূপে সাজিয়া উজ্জীর দরবারে আসিলেন।

তারপর নাজীর আসিলেন। তাহার সঙ্গে ছিল হাতী দুইটি, ঘোর-সওয়ার দুইজন, ঢাল-তরোয়াল ধারী সৈন্য অনুমান ষাট জন, বনাতের জিন দেওয়া ঘোড়া একটি ও চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া তিনটি ছিল। নাজীর মখমলের ছাউনি দেওয়া পালকিতে চড়িয়া আসিলেন। তিনি পরিয়াছিলেন ছাহানরের জামা, গুজরাটী সোনালী রংয়ের পটুকা, সোনালী কাজকরা জিরা, রূপালী গোছপেছ, আতলকের ইজার, শাল কাপড়, কোমরে সোনালী কাজকরা জামিয়ার, কানে মুক্তা ও গলায় হুগ্‌হুগী। দুইজন সেবক দুই দিকে দুইখানা ঢাল ও দুইটি তরোয়াল লইয়া আসিতেছিল। এইরূপে নাজীর দরবারে উপস্থিত হইলেন।

তারপর কার্কোন আসিলেন। তাহার সঙ্গে ছিল হাতী দুইটি, বনাতের জিন দেওয়া ঘোড়া একটি, চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া চারিটি, ঘোর-সওয়ার দুইজন এবং ঢাল-তরোয়াল ও বন্দুকধারী সৈন্য প্রায় ষাট জন। তাঁহার পরনে ছিল বৃন্দরী ছিটের জামা, বুটিদার জিরা, রূপালী গোছপেছ, সোনালী পটুকা, আতলকের ইজার, কানে মুক্তা ও সোনালী কাজকরা জামিয়ার। সঙ্গে একটি ঢাল ও একটি তরোয়াল লইয়া একজন সেবক আসিতেছিল।

পরে আসিলেন কোতোয়াল-মুহিব। তাহার সঙ্গে আসিল জরদ রংয়ের নিশান সাতটি এবং হাতী আটটি। হাতীগুলির মধ্যে দুইটির উপরে বনাত দিয়া ঢাকনি দেওয়া হইয়াছে ও উহাদের কপালে গোলাকৃতি সোনার গহনা দেওয়া হইয়াছে। বনাতের জিন ও সোনালী রংয়ের মুখ-ছাউনি দেওয়া ঘোড়া দুইটি এবং চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া আটটি, ঘোর-সওয়ার ছয়জন, ঢালী অমুমান চল্লিশ জন, বর্কন্দাজ প্রায় ত্রিশ জন এবং তীবন্দাজ অমুমান চল্লিশ জন তাহার সঙ্গে আসিল। তিনি পালকিতে চড়িয়া আসিলেন। ঐ পালকির উপরে বনাত দিয়া ছাউনি দেওয়া ছিল; ছাউনির উপরে দুই মাথায় রূপার দুইটি কলাফুল বসান ছিল; পালকির বেড়া বনাত দিয়া মোড়া ছিল এবং পালকির দরজায় রূপার তৈরী মকরের মুখ আটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কোতোয়াল-মুহিবের পরনে ছিল সোনালী রংয়ের বাদামী কাপড়ের জামা, সোনালী গুজরাটী জিরা, গোছপেছ, সোনালী পটুকা, গুজরাটী আতলকের ইজার। সোনালী রংয়ের একখানি তসর দেড়ভাঁজ করিয়া ঝাড়ের উপরে লইয়াছিলেন। পাগড়ির উপরে সোনার তরোলা দুইটি, কানে মুক্তা, গলায় পাথর খচিত কর্ঠাঙ্করণ, হুপ্‌হুপীর সহিত মুক্তার মালা এবং কোমরে সোনার হাতলের উপরে পাথর খচিত খঞ্জর একটি পরিধান করিয়াছিলেন। পালকির দুই দিকে সেবকেরা সোনার মুষ্ঠিযুক্ত তরোয়াল দুইটি, সোনার চোখ দেওয়া ঢাল দুইটি, এবং সোনালী রং করা বড়শি দুই গাছ লইয়াছিল। এইরূপে সাজিয়া

কোতোয়াল মুছিব দরবারে আসিলেন।

তারপরে দেওয়ান আসিলেন। ত হার সঙ্গে হাতী দুইটি, বনাতের জিন দেওয়া ঘোড়া একটি, চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া তিনটি এবং চাল-তরোয়াল-ধারী লোক অনুমান চল্লিশ জন ছিল। তাহার পরনে ছিল চিকণ কাপড়ের জামা, সোনালী কাজকরা জিরা, রূপালী গোছপেছ ও রূপালী পটুকা, আতলকের ইজার এবং শাল কাপড় একখানা। তিনি কানে মুক্তা ও গলায় সোনা দিয়া বাঁধা রুদ্রাক্ষের মালা দুই লহর পরিয়াছিলেন এবং একটি সোনালী জামিয়ার সঙ্গে লইয়াছিলেন। এইরূপে সাজিয়া মখমলের ছাউনি দেওয়া পালকিতে চড়িয়া দেওয়ান আসিলেন।

ইতঃপূর্বে চন্দ্রমণি ঠাকুর মুসলমানের রাজ্যে জামিনদার ছিলেন। রাজা হরিধন ঠাকুরকে জামিনদার করিয়া পাঠাইয়া চন্দ্রমণি ঠাকুরকে সেখান হইতে আনাইলেন। চন্দ্রমণি ঠাকুর দরবারে আসিবার সময় লাল নিশান ছয়টি ও হাতী চাবিটি সঙ্গে আনিলেন। ঐ চাবিটি হাতীর মধ্যে দুইটির উপরে বনাত দিয়া ঢাকনি এবং উহাদের কপালে গোলাকৃতি সোনার গহনা দেওয়া ছিল। তাহাছাড়া বনাতের জিন ও রূপার মুখছাউনি দেওয়া তুর্কী ঘোড়া দুইটি, টাঙ্গন ঘোড়া ছয়টি, ঘোব সওয়ার ছয় জন এবং চালী, বরকন্দাজ, তীরন্দাজ প্রভৃতি সকলে মিলিয়া প্রায় আশি জন লোক চন্দ্রমণি ঠাকুরের সঙ্গে দরবারে আসিল। সেই সময়ে চন্দ্রমণি ঠাকুরের পরনে ছিল সোনালী বুটদার জামা, গুজরাটী সোনালী পটুকা, সোনালী কাজকরা জিরা, রূপালী গোছপেছ, কানে মুক্তা, গলায় কণ্ঠাভরণ একটি ও দুই ছড়া মণি-গাঁথা-মুক্তার মালা এবং ঘাড়ের উপর একখানি শাল কাপড়। চন্দ্রমণি ঠাকুর পালকিতে চড়িয়া আসিলেন। পালকির ছাউনি বনাত দিয়া ঢাকা এবং বেড়া বনাত দিয়া মোড়ান ছিল। পালকির উপরে দুইটি রূপার কঁলা-ফুল দেওয়া ছিল। ছাউনির দুই মাথায় দুইটি রূপার তৈরী মর্কর মাষ্টের মুখ লাগাইয়া দেওয়া ছিল। ঐ পালকির দুই ধারে সেবকেরা সোনার চোখ দেওয়া চাল দুইখানা ও সোনার হাতলযুক্ত তরোয়াল দুইটি বহিয়া

নিতেছিল। ঐ পালকির উপরে একজন সেবক একটি আরোয়ান ধরিয়া আসিতেছিল।

তারপর নেমুজীর আসিলেন। তাহার সঙ্গে ছিল হাতী দুইটি, বনাতের জিনের ঘোড়া একটি, চামড়ার জিনের ঘোড়া পাঁচটি, ঘোড়-সওয়ার পাঁচজন এবং ঢাল-তরোয়াল-ধারী সৈন্য প্রায় ষাট জন। তাহার পরনে ছিল কার্পাস সূতায় তৈরী বৃটাদার জামা, বন্দরী ছিটের পটুকা, সামনের দিকে সোনার ঝালর দেওয়া রূপালী জিরা, আতলপের ইজার, শাল কাপড়, এবং কোমরে ছিল একখানি সোনালী কাজকরা জামিয়ার। একজন সেবক একটি ঢাল ও একটি তরোয়াল লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। মখমলের ছাউনি দেওয়া পালকিতে করিয়া নেমুজীর দরবাবে আসিলেন।

উপবোক্ত ব্যক্তিগণ ছাড়া বড়লোকদের মধ্যে কেহ পালকিতে উঠিয়া কেহ বা ঘোড়ায় চড়িয়া প্রায় ত্রিশ জনের মতন আসিলেন। তাহাদের অস্ত্র ছিল ঢাল ও তরোয়াল এবং কোমরে ছিল জামিয়ার। পাইক প্রায় এক হাজার পাঁচশত আসিয়াছিল এবং তাহাদের সঙ্গে ঢাল ও তরোয়াল ছিল। রাজার জয়গানকারী ব্রাহ্মণ, কাযেশ্বর, দৈবজ্ঞ, বৈজ্ঞ এবং অন্যান্য যাহারা ছিল সকলেই আসিল। তারপরে সেইদিন রাজধানীর লোকদিগকে দরবারে আনা হইল। রাজবাড়ীর সম্মুখে রাস্তার দুই-ধারে বড় তোপ দশটি এবং লম্বা কামান কুড়িটি পাতা হইয়াছিল।

তৎপর রত্ন মাণিকা রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন এবং ঐ সিংহাসনের ঘরে যাহাদের ঢুকিবার নিয়ম আছে তাহারাও ঐ ঘরে গেলেন। যাহাদের ঐ ঘরের সম্মুখের প্রাঙ্গণে থাকিবার নিয়ম তাহারা সেই নিয়মিত জায়গায় রহিল। তখন উদয় নারায়ণ বসিবার জায়গা হইতে উঠিয়া আমাদিগকে নিতে আসিলেন। আমরা সেখানকার দুই দূতের সঙ্গে রূপার-দুয়ারী ধর হইতে সোনার-দুয়ারী ঘরের মধ্যে গেলাম। সেই ঘরের আগের দিকে ছিল রাজা চড়িবার জন্ত চারিটি হাতী। তাহাদের উপরে বনাতের ঢাকনি এবং কপালে গোলাকৃতি সোনার অলঙ্কার দেওয়া ছিল। হাতীগুলির

গা জরির কাজ করা বনাত দিয়া মোড়া ছিল এবং প্রতিটি হাতীর দাঁতে আট জোড় করিয়া সোনার তারের বালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই ঘরের নিম্নভাগে ছিল রাজা চড়িবার জন্ত পালকি দুই খানা ; উহাদের দরজার উপরে সোনার পাত লাগান ছিল। পালকি দুইটির চারিদিকে চারিটি খুঁটা এবং ঐ গুলিতে সোনার কলকা কাটা ছিল। পালকির খুঁটাগুলি রূপা দিয়া তৈয়ারী করিয়া ঐ গুলির উপরে বনাত দিয়া ছাউনি দেওয়া হইয়াছিল এবং ছাউনির দুই মাথায় দুইটি সোনার কলা-ফুল বানাইয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পালকিগুলির গা বনাত দিয়া মুড়িয়া প্রত্যেকটির দুই মাথায় দুইটি কবীয়া সোনার বাঘের মুখাকৃতি করিয়া বানাইয়া আটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পালকির নিকটে রাজা চড়িবার তুর্কী ঘোড়া চারিটি ; উহাদের জিন সোনালী রংয়ের বনাতের তৈয়ারী এবং ঘোড়াগুলির মুখছাউনিও সোনালী রংয়ের ছিল। সিংহাসন-ঘরের সম্মুখে রাখা হইয়াছিল সোনার ত্রিশূল একখানা এবং চন্দ্রবাণ একটি, তাহাছাড়া লাল, সাদা, জরদ ও সবুজ বংয়ের নিশান ছিল প্রায় ত্রিশটি। সেখানে চাবিজন গুরুজবর্দার সোনার ও রূপার চারিটি লাঠি লইয়া উপস্থিত ছিল। সেই প্রাক্কণের দুই ধারে সোনালী ও রূপালী রংয়ের লাঠি প্রায় আশিটি রক্ষিত ছিল।

সেই সময়ে আমরাগিকে সোনার ছুয়ারী ঘর হইতে নিয়মানুযায়ী তিন জায়গায় নিয়া গেল এবং পরে আমরা সিংহাসন ঘরে ঢুকিলে আমাদের মধ্যে রত্নকন্দলী রাজাকে আশীর্বাদ এবং অর্জুনদাস প্রণাম করিল। তখন রাজার আদেশে দেওয়ান আসিয়া আমরাগিকের নিকটে পত্র চাহিলেন। রত্নকন্দলী তাহার মাথার পাগড়ি হইতে পত্রটি বাহির করিয়া দিল। সেই সময়ে রাজার আদেশে দেওয়ান আমরাগিকে সভাপণ্ডিতদের পঙ্ক্তিতে বসিতে বলিলেন এবং আমরা সেখানে বসিলাম। দেওয়ান ঐ পত্র পাঠ করিলেন। পরে দেওয়ান আমরাগিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “রত্নকন্দলী, অর্জুনদাস, আমাদের গৌসাই মহারাজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আপনারা যখন আসেন

তখন আপনাদের স্বর্গদেব রাজা কুশলে ছিলেন ত ?” আমরা বলিলাম, “আমাদের রওনা হওয়ার সময়ে স্বর্গদেব মহারাজা কুশলে ছিলেন।” দেওয়ান পুনরায় আমাদের বলিলেন, “রত্নকন্দলী, অর্জুনদাস, আমাদের মহারাজ বলিতেছেন যে, স্বর্গ মহারাজার প্রেমবর্ধক পত্র-সংবাদ শুনিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন যে, স্বর্গদেব রাজা যেন কুশলে থাকেন।” তখন আমরা বলিলাম, “উভয় পক্ষেই যেন মহামায়া ঐক্য করেন।” তারপর আমাদের ফুল-চন্দন, স্নগন্ধযুক্ত পান-সুপারি দিয়া নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, “এখন আপনারা বাসাঘ গিয়া আরাম করুন, আপনাদের যাওয়ার সময় হইলে আপনারা উক্ত পত্র-সংবাদের উত্তর পাইবেন।” তখন আমরা রাজাকে আশীর্বাদ ও প্রশংসা করিয়া সিংহাসনেব ঘর হইতে নামিয়া সোনার ছায়া ঘরের দিকে আসিলাম। সেই সময়ে সিংহাসন ঘরে যুবরাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজবংশীয়গণ, কোতোয়াল-মুহিব, সভাপণ্ডিত ও পুরোহিত বসিয়াছিলেন এবং উজ্জীব, নাজীব, নেমুজীব, কার্কোন, দেওয়ান, উচ্চশ্রেণীর কায়স্থগণ, বৈদ্য ও দৈবজ্ঞ শ্রেণীর লোকেরা দাঁড়াইয়া ছিলেন। সিংহাসন-ঘরের সম্মুখের উঠানে দেশের বড় বড় লোকেরা দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাজাব আদেশ হইলে সকলকে ফুল-চন্দন, স্নগন্ধযুক্ত সুপারি ও পান যাহাকে যে ভাবে দেওয়ার নিয়ম আছে সেই ভাবে দেওয়া হইল। তারপর রাজা উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন; সভাস্থ লোকেরাও নিজ নিজ বাড়ীতে গেল। তাবপর আমরাও আমাদের বাসাঘ চলিয়া আসিলাম। ১৬৩৪ শকাব্দের ৪ঠা বৈশাখ তারিখে ত্রিপুরার রাজা রত্নমাণিক্য আমাদের তাঁহার দরবারে অভ্যর্থনা করিলেন। সেইদিন রাজার পরনে ছিল চিকন খাছার জামা, সাদা চিকন কাপড়ের পাগড়ি, আঁচলে সোনার ঝালর দেওয়া কার্পাস সূতার পটুকা এবং গুজরাটী আত-লঙ্ঘের তৈয়ারী ইজার এবং তিনি ঘাড়ের উপরে একটি সাদা শাল কাপড় লইয়াছিলেন। পাথরখচিত ও সোনার হাতলযুক্ত একটি খঞ্জর তাঁহার কোমরে ছিল। ছইজন লোক সোনার হাতলের দুইটি গুরু চামড় তাঁহার

তুই পার্শ্বে দোলাইতেছিল। চিত্রিত তালপাতার পাখা দিয়া রাজাকে বাতাস করিতেছিল। রাজার পশ্চাতে বনাতের খাপে রক্ষিত এবং সোনার হাতলযুক্ত তরোয়াল চারিখানা এবং সোনার চক্ষু বিশিষ্ট ঢাল চারিটি লইয়া চারিজন সেবক দাঁড়াইয়া ছিল। দববাবের সময়ে রাজা এই ভাবে বসিয়াছিলেন। সেইদিন দরবারে যাওয়ার জন্য যখন রত্ন মাণিক্য রাজার দূত আমাদিগকে নিতে আসিল তখন আমরা তুইজন লোককে বাসায় রাখিয়া যাই। তাহাদিগকে বলা ছিল যে, আমরা দববারে চলিয়া যাওয়ার পরে তাহারা যেন ছদ্মবেশ ধরিয়া ত্রিপুরা রাজার দরবারের লোকজন ও সাজ-সবজাম কি পবিমাণ এবং তাহারা কি নিয়মে বা কাজ করে দেখিয়া আমাদিগকে যেন বলে। তাহারা তুইজন ছদ্মবেশ ধরিয়া আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী দরবারে যাইয়া সমস্ত দেখিয়া আসিয়া আমাদিগকে বলিল।

সপ্তদশ অধ্যায়

দূতগণ কর্তৃক আসামের যুদ্ধের বর্ণনা

আমরা দরবারে যাওয়ার তিন দিন পরে রাত্রি অচ্যুতান দুই দণ্ড গত হইলে রাজার দূত উদয় নারায়ণ আমাদিগকে গোপনে রাজার নিকট নিয়া গেলেন। তখন রাজা সিংহাসন-ঘরে সূজনি পাতিয়া বসিয়াছিলেন। সেখানে অপর কোনও দরবারের লোক ছিল না। তারপর আমাদের স্বর্গরাজা যে গোপন পত্র আমাদিগকে দিয়াছেন তাহা আমাদের হাত হইতে দেওয়ান লইয়া গোপনে পাঠ করিয়া রাজাকে শুনাইলেন। তখন রাজার আদেশে দেওয়ান আমাদিগকে বলিলেন, “রত্নকন্দলী, অর্জুন দাস, পত্রে যাহা লেখা আছে তাহা শুনিলাম, মৌখিক আর কিছু বলিবার আছে কি?” আমরা বলিলাম, “স্বর্গদেব মহারাজার আদেশে বড়বড়ুয়া নবাব বলিয়াছেন যে, গো এবং ব্রাহ্মণাদি জাতিগণকে ধর্মের সহিত প্রতিপালন করাই রাজার প্রধান ধর্ম; আমরা এই ধর্মীয় রাজার বিত্তমান থাকিতে যবন সকলে এই ধর্ম নষ্ট করিতেছে, তজ্জন্ত সকলে একমত হইয়া যবনকে নিগ্রহ করিয়া ধর্মরক্ষা করিলে যশ ও ধর্ম দুইই বৃদ্ধি পাইবে; এই কথা জানিয়া যাহা কর্তব্য মনে করেন তাহাই করিবেন।” তারপর দেওয়ান বলিলেন, “পত্রের কথা তোমরা পরিপূর্ণভাবে বলিয়াছ।” দেওয়ান আবার বলিলেন, “মাজুম খাঁ কি প্রকারে তোমাদের দেশ দখল করিল এবং মনুচুর খাঁ গুয়াহাটর (গৌহাটর) গড়ই বা কি প্রকারে দখল করিল?” তখন আমরা বলিলাম, সেই সময়ে আমাদের মহারাজার পিতামহ জীবিত ছিলেন। তিনি বাহুলি ফুকনকে সর্দার নির্বাচিত করিয়া যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। বাহুলি ফুকন

গুয়াহাটীর গড়ে মাজুম খাঁর সঙ্গে সাত দিন যুদ্ধ করিলেন। তারপর মহারাজ বাহুলি ফুকনকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, “পূর্বে বাইশ উমরাহদের সহ নবাব মাজুম খাঁর সৈন্য বার বার বিজয় করা হইয়াছে; বর্তমানে এত লোকজন এবং অস্ত্র শস্ত্র লইয়াও তুমি কিছুই করিতে পারিতেছ না।” এই কথা বলিয়া রাগ করিয়া মহারাজ বাহুলি ফুকনের জন্ত স্ত্রীলোকের পোষাকাদি পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে বাহুলি ফুকনের মনে সংশয় জন্মিল এবং সে মুসলমানের পক্ষ অবলম্বন করিল। এই ঘটনায় আমাদের লোক-লস্কর সকলেই পলায়ন করিল তারপর মাজুম খাঁ আসিয়া ছামধরা গড়ে উপস্থিত হইল। মহারাজ এই কথা শুনিয়া ছামধরা গড়ে লোকজন পাঠাইয়া দিলেন। তারপর ছামধরা গড়ে বাইশ দিন ব্যাপি নানাপ্রকারে যুদ্ধ হইল। মাজুম খাঁ বহু বীর প্রদর্শন করিয়াও ছামধরা দুর্গ জয় করিতে না পারিয়া সেই জায়গায় থানা বসাইয়া তাহাতে থাকিতে লাগিলেন। পরে আমাদের লোকজনেরা তাহার ঐ সব থানা জয় করিল এবং মাজুম খাঁর সৈন্যদের পথ বন্ধ করিল। মাজুম খাঁর লোকজন কোনও জিনিসপত্র কিনিতে না পারিয়া খাওয়ার অত্যন্ত কষ্ট পাইল। তখন মাজুম খাঁ ছামধরা গড় পরিত্যাগ করিয়া গুয়াহাটীর দিকে গেলেন এবং সৈয়দ ফিরোজ ও সৈয়দ ছালাকে হুবা নিযুক্ত করিয়া ছামধরায় রাখিয়া গেলেন। তারপর আমাদের লোক-লস্করেরা ছামধরায় গিয়া যুদ্ধ করিয়া সৈয়দ ফিরোজ ও সৈয়দ ছালাকে তাহাদের লোকজনদের সহ ধরিয়া আনিল। বাদশা এই খবর পাইয়া রামসিংহকে পাঠাইয়া দিলেন। রামসিংহ আসিয়া বহু বীরত্বের সহিত অনেকদিন যুদ্ধ করিয়াও না পারিয়া রাজ্যমাটিতে চলিয়া গেলেন। রামসিংহ যুদ্ধ জয় করিতে পারে নাই শুনিয়া বাদশা ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁকে নেওয়াইলেন। তারপর বাদশানন্দন আজম তারাকে বাংলা দেশের হুবা নিযুক্ত করিয়া বলিয়া দিলেন “তুমি আসাম জয় করিও”; এবং রামসিংহকে আজমীড়ের যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। আজম তারা আসিয়া যুদ্ধের অবস্থা খারাপ দেখিয়া গুয়াহাটীর বড় ফুকনের সহিত সম্ভাব সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বলিলেন, “কিছুদিনের জন্ত আমাকে

গুয়াহাটী ছাড়িয়া দাও, আমি পরে আবার উহা তোমাকে ফিরাইয়া দিব ; ইহাতে বাদশার নিকট আমার একটা মর্যাদা থাকিবে ।” আজম তারা গুয়াহাটীর বড় ফুকনকে অনেক জিনিসপত্রও দিলেন । তারপর বড় ফুকন নিজে ইচ্ছা করিয়া গুয়াহাটী ছাড়িয়া দিলেন । তখন আজম তারা মনুছুর খাঁকে গুয়াহাটীর থানাদার হইয়া থাকিবার জন্ত পাঠাইলেন এবং মনুছুর খাঁ আসিয়া গুয়াহাটীতে থানা করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন । এই ঘটনার পরে আমাদের মহারাজের পিতা সেই বড় ফুকনকে বধ করিলেন । মনুছুর খাঁর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হইল ; মনুছুর খাঁ পলায়ন করিলেন । মনুছুর খাঁর অস্ত্র-সত্ত্ব এবং বহু লোক-লস্কর ধরিয়া আনা হইল এবং গুয়াহাটীর গড় দখল করা হইল ।” আমরা এই সমস্ত কথা বলার পর দেওয়ান বলিলেন “সেই জন্তাইত বাহুলি ফুকন এই সময়ে ঢাকায় বাস করিতেছিল ।” তারপর রাজা আমাদের বিদায় দিলেন এবং রাজার লোকেরা আমাদের বাসায় আনিয়া পৌছাইয়া দিল ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ত্রিপুরায় মদন পূজা ও মোট খেলা

বৈশাখ মাসের দশ দিন অতীত হইলে কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে মদন পূজার অধিবাস হইল। সেই দিন সেই দেশের লোকদের দেশাচার নিয়মে মাংসতা অনুসারে উপহার দেওয়ার নিয়ম আছে। রাজা সেই নিয়মে সকলকে উপহার দিলেন। আমাদিগকেও সিংহাসন-ঘরে আসিয়া ডিমের কুসুমের রংয়ের জামা, রঙ্গিন পাগড়ি, রঙ্গিন পটুকা এবং রঙ্গিন দোপাট্টা উপহার দিলেন। খেলিবার জন্ত আমাদিগকে চামড়ার মোটও ছুইটি দিলেন। আমাদের সঙ্গে লোকদিগকে রঙ্গিন পাগড়ি ও দোপাট্টা এবং তাহাদের প্রতিজনকে খেলিবার জন্ত একটি করিয়া মোট দিলেন। তারপর সেইদিন আমাদিগকে বাসায় পাঠাইয়া দিলেন।

পরের দিন কলাগাছের খোল দিয়া চৌচালা করিয়া একটি ঘর বানাইয়া সাজান হইল। ঐ ঘরের ভিতরে মাটির কামদেবের মূর্তি সাজাইয়া পূজার ব্যবস্থা করা হইল। এই পূজার আয়োজনে বড় বড় করিয়া লাড়ু বানাইয়া দেওয়া হইল। পূজা শেষ হইলে রাজা আসিয়া কামদেবকে প্রণাম করিয়া সোনার নল দিয়া কামদেবের গায়ে জল ছিটাইয়া দিলেন এবং পরে ঘুরাজ ও অগ্ন্যস্ত্র বড় লোকেরা আসিয়া প্রণাম করিয়া রূপার নল দিয়া কামদেবের গায়ে ঐ রূপ জল দিলেন। তারপর রাজার আদেশে আমরাও কামদেবকে প্রণাম করিয়া কামদেবের গায়ে জল ছিটাইলাম এবং অগ্ন্যস্ত্র বাহিরের লোকেরাও পত্রম্পর জল ছিটাইয়া দিলেন।

লাগিল। সুগাথকেরা তাল মিলাইয়া মৃদঙ্গ বোণে সংকীর্তন করিতে লাগিল। সেইদিন রাজা সাদা পোষাক পরিয়াছিলেন। যুবরাজ প্রভৃতি সকল লোকেরা রাজার দেওয়া উপহারের কাপড় পরিয়া সেইখানে আসিয়াছিলেন। রাজা কাহাকেও বা ডাকাইয়া আনিয়া কাপড় পরাইয়া দিলেন। তারপর রাজা অন্তরে গেলেন, অস্ত্রাশ্রেরাও নিজ নিজ বাড়িতে গেল। আমরাও আমাদের বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। পরের দিন পূর্বের মত যুবরাজ প্রভৃতি বড় বড় লৌকেবা দরবারে আসিলেন। আমাদেরকেও দরবারে আনা হইল। তাবপর রাজা অন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সেইদিন রাজার পশনে ছিল গুজরাটী সোনালী তসবের জামা, সোনালী কাছবরা জিবা, সোনালী গোছপেছ, সোনালী পটুকা এবং সোনালী কুটিলাব ইজার। একখানা সাদা শাল কাঁধের উপর লইয়াছিলেন। সোনার তরোলা দুইটি এবং হীরা ও পাথর খচিত কলকা একটি হামাউ চবাই পাখীর পাখার সঙ্গে পাগড়িতে গাঁথিয়া লইয়াছিলেন। মুক্তা ও পান্নায গাঁথা একটি মালা দুই পৈচ করিয়া পাগড়িতে পরিয়াছিলেন। রাজার কানে মুক্তা এবং গলায় হীরা ও পাথর খচিত কণ্ঠভরণ এবং ঐ কণ্ঠভরণে মুক্তার কালর দেওয়া ছিল। ঐ কণ্ঠভরণের মাছখানে হীরাখচিত ছগ্‌ছগী একটি ছিল। নাভি পর্যন্ত বুল দিয়া তিম পৈচ কব্বিয়া মুক্তার মালা পরিয়াছিলেন। বাহুতে হীরা ও পাথর খচিত খাদু পরিয়াছিলেন। হাতের দশ আঙ্গুলে দশটি হীরা ও পাথর খচিত আংটি পরিয়াছিলেন এবং কোমরে হীরা ও পাথর খচিত বন্ধর একখানা লইয়াছিলেন।

রাজা এইরূপে সাজিয়া আসিলার সময়ে হাতীর উপরিভাগ সাজান কইতেছিল। হাতীর উপরে চারিখানি তক্তা দিয়া ভোড়া করিয়া আসনটির দেয়ালট করা হইয়াছিল। সেই উক্তার উপর হাতীর লাঠের মানারূপ কাজ করা ছিল। সোনার সাজও উক্তাতে বানান ছিল। এই তক্তাগুলির মাঝখানে দুই-তিনটি খলান হইয়াছিল। চারিদিকে চারটি সোনার খুঁটা দিয়া গুজরাটী উপর চারিখানা বস্ত্রের দর সাজান হইয়াছিল। সেই ঘরের

চারিধারে বনাত কাটিয়া পানের আকারে বানাইয়া তাহাতে সোনার গুলি
ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ বনাতেই ঘরের উপরে সোনার তৈয়ারী
কলাফুল একটি দেওয়া হইয়াছিল। মূল আসনের তলে দিয়া হাতীর
পেটের সাহিত দড়ি দিয়া পঁচ দিয়া বাঁধা হইয়াছিল। রাজা হাতীতে উঠিয়া
ঐ ঘরে গালিচার উপরে বসিলেন। তারপর যুবরাজ প্রভৃতি বড় বড়
লোকেরা আসিলেন। তামাশা দেখিবার জন্ত অনেক লোকও আসিল।
রাজা আমাদিগকেও সেখানে নেওয়াইলেন। তারপর রাজা মোট খেলিবার
জন্ত গোমতী নদীতে আসিলেন। সেই সময়ে রাজর অগে আগে হাতীব
উপরে, ঘোড়ার উপরে এবং মাটিতে মানুষ নিশান লইয়া যাইতেছিল।
তাহাছাড়া লোক হাতীর উপরে নাকাড়া বাস্ত্র বাজাইতে বাজাইতে
চলিয়াছিল। ঢাল, তরোয়ালা এবং বন্দুক লইয়া অনুমান এক হাজার পাঁচ-
শত লোক এবং ঘোড়-সওয়ার চল্লিশ জন ও চৌদ্দটি হাতী রাজার সঙ্গে
নদীর দিকে যাইতেছিল। এই সমস্ত ছাড়া সোনা-রুপার কাজ করা
পোশাকে সাজাইয়া রাজা চড়িবার জন্ত ঘোড়া চারিটি, হাতী তিনটি এবং
পালকি দুইখানা সঙ্গে যাইতেছিল। সোনার এবং রুপার লাঠি লইয়া চার-
জন গুরুজ্বরদাঁব চলিয়াছিল। বাজাব নিকটে একপাশে অপর একটি
হাতীতে চড়িয়া একজন লোক একটি আরোহণ ধবিয়াছিল এবং অপর
একজন লোক একটি ঢাল ও একটি তরোয়ালা লইয়া চলিয়াছিল; এবং
রাজার অপর পাশে অগ্র একটি হাতীতে উঠিয়া একজন লোক রাজাকে
চামর তুলাইতেছিল এবং অপর একজন ঢাল ও তরোয়ালা লইয়া উপস্থিত
ছিল। রাজার আগে আগে শিবের ত্রিশূল অর্থাৎ চন্দ্রবাণ লইয়া একজন
চলিয়াছিল। রাজার পিছে পিছে গিয়াছিল ঘোড়-সওয়ার অনুমান বিশ জন
এবং ঢাল-তরোয়ালা এবং বন্দুক-ধারী লোক অনুমান দুই হাজার। তাহাছাড়া
যুবরাজ প্রভৃতি বড় বড় লোকেরা মর্যাদা অনুযায়ী নিজ নিজ সরঞ্জাম ও
লোকজন লইয়া কেহ বা হাতীতে কেহ বা ঘোড়ায় চড়িয়া গোমতী নদীর
দিকে শ্বেলেন। তামাশা দেখিবার জন্ত স্বেহারা আসিয়াছিল তাহারাও

রাজার আগে এবং পিছনে নদীর দিকে গেল। সেই দিন রাজার সঙ্গে কুম্ভমান দশ বার হাজার লোক গোমতী নদীতে গিয়াছিল। রাজা এইরূপে গিয়া গোমতী নদীর জলে হাতীর উপবে বসিয়া রহিলেন। পরে যুবরাজ ও অন্যান্যেরা জলে না মিয়া দুই ভাগ হইয়া মোট দিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি জল ছিটাইয়া খেলিতে লাগিলেন। গোমতী নদীর নিকটে একটি কুঁজী ঘর ছিল; রাজার আদেশে আমরা সেখানে বসিলাম। রাজার লোকেরা আমাদের সঙ্গে লোকজনকে মোট খেলিবার জন্তু নিয়া গেল এবং তাহাবাও খেলার জায়গায় গিয়া খেলায় যোগ দিল। তারপর রাজা সেখান হইতে গিয়া অমবসাগর দিঘিতেও এইরূপ আমোদ ভোগ করিলেন। রাজা এইরূপে মোট খেলার তামাশা দেখিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, অন্যান্যেরাও নিজ নিজ বাড়ীতে গেল। আমরাও আমাদের বাসার দিকে রওনা হইলাম।

তারপর রাজার আদেশে কামদেবের পূজায় যে সমস্ত দধি, দুগ্ধ, ক্ষীরের লাড়ু, ভাজের লাড়ু ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছিল তাহা ভাগ করিয়া বড় বড় লোকদের ও অন্যান্য ভাল লোকদের জন্ত পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং আমাদের জন্তও দেওয়া হইল। তাহাছাড়া রাজা সেই সময় সকলকে পোশাক পরিচ্ছদও দিয়াছিলেন। আমাদেরকেও পোশাক দিয়াছিলেন। রাজা বাহিরে যাওয়ার সময় এবং নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময় নগরের স্থানে স্থানে দশ পাঁচ জন স্ত্রীলোক একত্র হইয়া কলাগাছের চারা লাগাইয়া তার নীচে প্রদীপ ও ঘট রাখিয়া উল্লুখনি করিতেছিল। সেই সমস্ত স্ত্রীলোকদের জন্ত রাজার আদেশে রাজার সেবকগণ আধূলি, সিকি, দোয়ানি, এক জ্বানি, আধ আনি মুঠ মুঠ করিয়া উড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছিল।

ঊনবিংশ অধ্যায়

রাজার বিরুদ্ধে ঘনশ্যামের সৈন্ত-সংগ্রহ

মোট খেলাব দুই চাবিদিন পব বাজা ঘনশ্যাম ঠাকুরের জন্ত লোক দিয়া মোট খেলার উপহাব পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, “বড়-ঠাকুর, আজ ছয় মাস হয় হাতী ধবিবার জন্ত গিয়ছ, এখনও আসিলে না। আমাদের এখানে স্বর্গ রাজার দূতগণকে দববারে সংবর্ধনা করা হইয়াছে, মোট খেলাও শেষ হইয়াছে, বর্ধাকাল আগত প্রায়। এখন স্বর্গ রাজার দূতগণকে বিদায় দিবার সময় হইয়াছে। এই সমস্ত কথা ভাবিয়া সহর লোকজন সঙ্গে লইয়া চলিয়া আস।” ঘনশ্যাম ঠাকুর রাজার এই আদেশ শুনিয়া রাজার ববাববে এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে বলিলেন, “গৌসাই মহারাজ উত্তম আদেশ দিয়াছেন। আমাদের এখানের কাজ শেষ হইয়াছে, আমরা সহরই রওনা হইব।” ঘনশ্যাম ঠাকুর এইকপে পত্র লিখিয়া রাজার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর রাজা ঘনশ্যাম ঠাকুরের পত্র পাইয়া ও পত্রের বিষয় অবগত হইয়া চূপ করিয়া রহিলেন।

ঘনশ্যাম ঠাকুর হাতী ধবিতে যাওয়ার পরেই গোপনে ঢাকায় মুরাদ-রেগের নিকট লোক পাঠাইয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, “পূর্বে মির্জার সঙ্গে আমাদের যে রূপ কথা ছিল তদনুযায়ী আমি হাতীধরার জায়গায় থাকিতে থাকিতে লোকজন সঙ্গে করিয়া সহর মির্জা আমাদের সহিত একত্র হউক— এই কথা মীর মামুদকে বলিয়া তাহার ভাগিনা মামুদ ছব্বিকে সঙ্গে করিয়া আনিব।” মুরাদবেগ বলিয়া পাঠাইল, “কথা অনুযায়ী আমি সমস্ত করিয়াছি। যে সমস্ত লোক পাওয়া গিয়াছে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি।

এবং আরও লোকের জন্ত কথাবার্তা ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। বড়ঠাকুরের আদেশ পাইলে ঐ লোকদের ছই এক শত করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারি। এক্ষণই আমি সেখানে গেলে ভাল হইবে না বলিয়া মনে করি। আপনি যাহা আদেশ করেন আমি তাহাই করিব।” এই সংবাদ পাইয়া বড়ঠাকুর বলিয়া পাঠাইলেন, “মির্জা ভাল কথাই বলিয়াছেন, যে ভাবে ভাল মনে হয় সেই ভাবেই লোক পাঠাইয়া দিও।” এই সংবাদ পাইয়া মুরাদবেগ্ হিন্দুস্থানী ঢালী নিযুক্ত করিয়া ছই একশত করিয়া পাঠাইতে লাগিল।

যে সমস্ত লোক ঘনশ্যাম ঠাকুরের সঙ্গে গিয়াছিল তাহারা হাতী ধরিয়াছিল। ঘনশ্যাম গোপনে বঙ্গদেশ হইতে লোক আনাইয়া নিজে রাজা হওয়ার জন্ত যে অভিনয় করিয়াছে রাজা তাহা জানিতে পারিলেন না। ঘনশ্যামের ভয়ে ঘনশ্যামের সঙ্গে লোকেরা রাজাকেও এই কথা জানাইল না। ঘনশ্যাম দলে দলে বাঙ্গালাদেশ হইতে লোক আনাহেতে জানিতে পারিয়া যুবরাজ ও রাজার ভগ্নীপতি কোতোয়াল মুহিব উভয়ে যুক্তি করিয়া গোপনে অগ্ন সময়ের নিয়মের চেয়ে বেশী করিয়া তীরন্দাজ, হিন্দুস্থানী ইত্যাদি লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। তাহারা মনে করিলেন যে ঘনশ্যাম বাঙ্গালা দেশের লোকজন নিযুক্ত করিয়া লইয়া আসিতেছে; পাছে সে কিছু অনিষ্ট করে তজ্জন্ত আমরাও একটু সতর্ক হই। এদিকে ঘনশ্যাম হাতীধরা শেষ করিয়া মুরাদবেগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, “মির্জা যে সমস্ত লোক পাঠাইয়াছেন তাহারা আসিয়া আমার এখানে পৌঁছিয়াছে। এখন মির্জা মামুদ ছফিকে গৃথক করিয়া এখানে পাঠাইবেন। মামুদ ছফ আসিয়া এ দেশের লোকদিগকে বলিবে যে সে ইর্শালের পাওনা হাতী লওয়ার জন্ত আসিয়াছে। মামুদ ছফির সঙ্গে এবিষয়ে পূর্বে আলাপ করিয়া তাহাকে পাঠাইবা। মির্জা নিজেও ঘোড়-সওয়ার, হিন্দুস্থানী ও তীরন্দাজ যাহা যোগাড় হয় সঙ্গে লইয়া শীঘ্র চলিয়া আসুক।”

পরে মুরাদবেগ্ এই সংবাদ পাইয়া মীর মুরাদকে এই কথা জানাইয়া ঘোড়-সওয়ার, হিন্দুস্থানী সৈন্য, তীরন্দাজ এইসব সংগৃহীত লোক সঙ্গে দিয়া

মামুদ ছকিকে মির্জাপুরে পাঠাইয়া দিল। মামুদ ছকি মির্জাপুরে আসিয়া সেখানকার লোকদিগকে বলিলেন যে “যুবরাজ চম্পক রাইয়ের সময়ের হাতী পাওনা রহিয়াছে। সেই হাতী নিয়া যাওয়ার জন্ত আমি আসিয়াছি।” ঘনশ্যাম ঠাকুর যে নিজে রাজা হওয়ার জন্ত তাহাদিগকে আনাইয়াছেন এ কথা লোকেব নিকট প্রকাশ করিলেন না। পরে মুরাদ বেগ, ষোড়-সওয়ার, বরবন্দাজ, তীরন্দাজ প্রভৃতি লোক নিযুক্ত করিয়া সঙ্গে করিয়া ঢাকা হইতে আসিয়া ঘনশ্যাম ঠাকুরের সঙ্গে যোগ দিল। এদিকে ঘনশ্যাম ঠাকুর ধরা হাতীগুলি আনিবার জন্ত প্রয়োজনীয় লোক নিযুক্ত করিয়া কাজের শৃঙ্খলা করিয়া দিলেন। ঐ সমস্ত হাতীর মধ্যে দশটি প্রথমে বাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ঐ হাতীর সঙ্গে যে যে লোক প্রয়োজন তাহাও দিলেন এবং রাজার আপনজন বলিতে যাহারা সঙ্গে ছিল তাহাদিগকেও সেই সঙ্গে রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজের আপনার লোকদিগকে সঙ্গে রাখিলেন। ঘনশ্যাম ঠাকুর রাজার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে “পূর্বে মুরাদ বেগ, অসন্তুষ্ট হইয়া ঢাকার চলিয়া গিয়াছিল। আমি তাহাকে প্রবোধ ও ভরসা দিয়া লোক পাঠাইয়া আনাইয়াছি; আমার সঙ্গে একত্রে সে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে।” ঘনশ্যাম কপটতা করিয়া ঐ সংবাদ রাজাকে পাঠাইলেন। তারপর ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর মুরাদ বেগকে সঙ্গে লইয়া লোক-লস্করের সহিত হাতীধরার জায়গা হইতে চলিয়া আসিয়া মির্জাপুরে মামুদ ছকির সঙ্গে মিলিত হইলেন।

ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বিদেশের লোক-লস্কর সঙ্গে লইয়া আসিতেছে শুনিয়া যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব একত্রে পরামর্শ করিয়া গোপনে রাজাকে বলিলেন, “ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বঙ্গদেশের অনেক লোক-লস্কর নিযুক্ত করিয়া সঙ্গে আনিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এ বিষয়ে মহারাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন পাছে সে কোনও বিপদ না ঘটায়; এ বিষয়ে ভাল কথা শুনিতেছি না।” এই কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন

“তোমরা কোনও সন্দেহ করিও না। ঘনশ্যাম আমাকে জানাইয়া আসিতেছে। সে বলে যে সে মুরাদ বেগকে নিয়া আসিয়াছে এবং মুরাদ বেগের সঙ্গে কিছু লোকও আসিয়াছে। তবু যখন তোমরা একরূপ বলিতেছ অমি লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইব।” রাজা এই কথা বলিয়া তাহাদের দুইজনকে নিজ নিজ বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন।

তারপর রাজা ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের নিকট লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “পূর্বে আমাকে জানাইয়াছ যে মুরাদ বেগের সঙ্গে কিছু লোক আসিয়াছে, কিন্তু এখন শুনিতেছি যে তাহার সঙ্গে বহু সৈন্য সামন্ত আসিয়াছে।” এই কথা শুনিয়া ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন “আমি মহারাজার আদেশের দাস। মহারাজ মুরাদ বেগকে আনিতে বলিয়াছেন তজ্জন্ত আমি মুরাদ বেগকে আনাইয়াছি; তাহার সঙ্গে কিছু লোকও আসিয়াছে। হাতীর ইর্শালের বিষয়ে মামুদ ছকিও আসিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে কিছু লোকজনও আসিয়াছে। আমি মামুদ ছকিকে কি বলিতে পারি? মহারাজ আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন দেখিয়া অনেকে অনেক কথা বলে। এ বিষয়ে মহারাজ নিজে চিন্তা করিয়া দেখিলেই ভাল হয়। তাহা ছাড়া পূর্বে এইরূপ বগড়া কলহের দ্বারা যে সমস্ত অনিষ্ট ঘটিয়াছে তাহাও মহারাজ জ্ঞাত আছেন।” ঘনশ্যামের লোক এইরূপে রাজাকে জানাইয়া চলিয়া আসিল।

বিংশ অধ্যায়

ঘনশ্যাম, মুরাদ বেগ এবং মামুদ ছফির মন্ত্রণা

তারপর ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর, মুরাদ বেগ, এবং মামুদ ছফি এই তিনজন পরামর্শ করিয়া মামুদ ছফি দ্বারা এক পত্র লেখাইয়া রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ঐ পত্রে লেখা ছিল, “চম্পক রাইয়ের সময়ের যে সব হাতী-দেওয়া বাকী রহিয়াছে তাহা মহারাজ দেন নাই, এ বিষয়ে পূর্বেও বার বার জ্ঞানান হইয়াছে। যদি বাদশা এই কথা জানিতে পারেন তবে অমঙ্গল হইবে। আমি নিজে এ বিষয়ে মহারাজের সাক্ষাতে বলিলে ভাল হইবে বলিয়া মনে করি। ঘনশ্যাম ঠাকুরকেও বলা হইয়াছে; কিন্তু সে বলে যে “চম্পক রাইয়ের সময়ে তোমরা কেন হাতী লইলে না? এখন আমরা কেমন করিয়া ঐ বাকীপড়া হাতী দিব?”

তারপর ঘনশ্যাম মুরাদ বেগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মামুদ ছফিকে বলিলেন, “দেশের সকল লোক রাজার ইষ্ট। তুমি বুদ্ধি করিয়া আমাকে রাজা কর, আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা দিব।” মুরাদ বেগ, মামুদ ছফিকে বলিল, “সাহেব যদি বড়ঠাকুরকে রাজা করেন তবে এ দেশের সকল লোকে সাহেবের ক্ষমতা টের পাইবে।” তারপর মামুদ ছফি বলিলেন, “মীর মুরাদ আমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে যদি দেশের লোকজন রত্নমাণিক্য রাজার কারণে কষ্ট পায় এবং যদি তাহারা ঘনশ্যামকে রাজা করিতে চাহে তবে দেশের লোকজনের পক্ষে সাহায্য করিও। এখন তোমরা বলিতেছ যে দেশের সকল লোকজন রাজার দ্বিভাবী। এই অবস্থায় আমি কিরূপে এই কার্যে অগ্রসর হইব?”

তবু ও তোমাদের কথামত যুবরাজের চাকরি তোমাকে দেওয়া হইবে এবং কোতোয়াল মুছিব হইতে যে কষ্ট পাইয়াছ তাহা দূর করা হইবে। তখন মুরাদ বেগ বলিল, ‘এখন বড়ঠাকুরের একটি কথাও বলিবাব প্রয়োজন নাই। সাহেব যখন বাজধানীতে পৌঁছেন তখন যেকপ উচিত মনে করেন তাহাই করিবেন।’ ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন, “মির্জাই আমার সব ভরসার স্থল; মির্জা আমাকে কখনও ফেলিতে পারিবেন না।” তারপর মামুদ ছফি বলিলেন, “বড়ঠাকুরের ভোগে যাহা নিদ্দিষ্ট আছে যাহা হইবেই। তথাপি তোমরা আমাকে যে বলিতেছ তাহাতে আমি বলি যে আমার দ্বারা যাহা সম্ভব তাহা আমি করিব।”

তখন ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন, আমাদের তিন জনের মধ্যে যেন কোন মতানৈক্য না হয় তজ্জন্ম আমাদের একটি শপথ গ্রহণ কর। দরকার এবং তবেই কেবল আমরা এই ব্যাপারে নিঃসংশয় হইতে পারি।” মামুদ ছফি বলিলেন, “ভাল কথা, যাহা করিলে তোমাদের মনের সংশয় দূর হয় তাহাই কর।” তারপর তাম্মা, তুলসী ও কোরাণ তিন জনের সম্মুখে রাখা হইল এবং তাহারা বলিলেন, “এই প্রতিজ্ঞাব কথা কেহ কাহাকেও প্রকাশ করিবে না, করিলে তাহাব ধর্মহানি হইবে এবং ঈশ্বর ও খোদা তাহাকে শাস্তি দিবেন।” এইরূপে তিনজনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া মির্জাপুর হইতে উদয়পুর নগরে আসিবার জন্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মামুদ ছফি পত্র পাইয়া রাজা যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিবকে ডাকাইয়া আনাইলেন এবং বলিলেন, “মামুদ ছফি চম্পক রাইয়ের সম্মুখে বাকীপড়া হাতীর কথা লিখিয়াছে। মামুদ ছফি ঘনশ্যাম ঠাকুরকেও বলিয়াছিল কিন্তু সে এ বিষয়ে গাম্ভীর্য নাই, তবু তোমরা ঘনশ্যামের দৌর-দেও, জাহাঙ্গীর কোমর দোব নাই। ঘনশ্যাম বাঙ্গাল দেশ হইতে অনেক লোক আনাইয়াছে বলিয়া তোমরা যে সন্দেহ করিতেছ তাহারা মামুদ ছফির সঙ্গে আসিয়াছে, ঘনশ্যাম সন্দেহজনক আলোচ্য নাই।” এই

কথা বলিয়া রাজা মানুদ ছফি যে পত্র পাঠাইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং বলিলেন, “মানুদ ছফি যখন আসিতে চায় তাকে কি আশিতে না দেওয়া ভাল হইবে? না অশিতে দেওয়াও ত ভাল মনে হয় না।” তখন যুবরাজ ও কোতোয়াল মুহিব বলিলেন, “মহারাজকে যে পত্র লেখা হইয়ছে তাহা চতুরতাপূর্ণ, আসল কথা অনুরূপ। ঘনশ্যাম ঠাকুর মানুদ ছফি ও মুরাদ বেগের সঙ্গে পণ্যমর্গ করিয়া বিদেশ হইতে লোকজন আনাইয়া বিপদ ঘটাইবার জ্ঞান মনস্ত করিয়াছে। মহারাজ বিশেষ করিয়া এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখিবেন। এই কথা নিশ্চয় মনে করিয়া মহারাজ আমাদের সঙ্গে আদেশ দেন যেন আমরা লোকজন লইয়া চণ্ডীগড়ে গিয়া অপেক্ষা করি এবং সেখানে থকিয়া আমরা ঘনশ্যাম ঠাকুর, মুরাদ বেগ ও আমাদের দেশের লোকজনকে আনিয়া তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা করিয়া পরে তাহাদের সঙ্গে আমরা একত্রে রাজধানতে আসি। মানুদ ছফি নিজের লোকজন লইয়া নঙ্গপুরে অপেক্ষা করুক। পরে মহারাজ আলোচনা করিয়া যাহা ভাল মনে করেন তাহাই করিবেন। তারপর রাজা বলিলেন, “ঘনশ্যাম আমার কনিষ্ঠ ভাই হয়। তাহাকে আমি বড়ই বিশ্বাস করি। সে আমার শত্রুতা কেন করিবে! ঘনশ্যামকে একটুও সন্দেহ করিও না। মনে হয় মানুদ ছফির সঙ্গে ঘনশ্যাম আসলেই ভাল হয় কারণ তাহা না হইলে পরিণামে খারাপ হইতে পারে।” রাজা এই কথা বলার পর যুবরাজ ও কোতোয়াল মুহিব বলিলেন, “আমরা মনে প্রাণে মহারাজের মঙ্গলচিন্তা করিয়া যাহা বলা উচিত তাহাই বলিলাম, কিন্তু আমাদের কথা মহারাজের মনে প্রবেশ করিতে পারিল না। মহানারায়ণ যাহার জ্ঞান যতখানি ভোগ্য নির্দিষ্ট করেন সে তাহাই ভোগ করে। আমাদের পৌরুষের দ্বারা কোনও ফল হয় না। এখন বুঝিতে পারিলাম ভগবতী আমাদের উপর বড়ই রুষ্ট হইয়াছেন। তাহাছাড়া যার কর্তব্যফল যেরূপ আছে তাহা কেহই খণ্ডাইতে পারে না।” এই কথা বলিয়া যুবরাজ ও কোতোয়াল মুহিব অসন্তুষ্ট চিত্তে নিজ নিজ বাড়িতে চলিয়া আসিলেন।

একবিংশ অধ্যায়

রাজধানীর নিকটে সসৈন্তে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর

তাবপর রাজা 'ঘনশ্যাম ঠাকুর মামুদ ছফিকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে আসুক-এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। ঘনশ্যাম ঠাকুর বাজার আদেশ শুনিয়া লোকলস্কর ও মামুদ ছফিকে সঙ্গে লইয়া উদয়পুর নগরে আসিলেন এবং রাজবাড়ী হইতে কিছু দূরে গোমতী নদীর অপব পাড়ে তাম্বুকানাত খাটাইয়া তাহাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেইদিন ঘনশ্যাম বাজার নিকট আসিলেন না। ঘনশ্যাম ঠাকুর বাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন, “আমি মামুদ ছফির সঙ্গে আসিয়া এখানে আছি; পবে দিন-রুণ দেখিয়া মহাবাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।” তাবপর রাজা মামুদ ছফিব জন্তু সিধা ও ঘনশ্যাম ঠাকুরের জন্তু ফুলচন্দন এবং রূপাব বাটায় করিয়া কাটান্সপারি ও পান পাঠাইয়া দিলেন।

পরদিন ঘনশ্যাম ঠাকুর, মামুদ ছফি ও মুবাদ বেগ একত্র হইয়া আলোচনা করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, “মুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব দেশের প্রধান এবং রাজার বড়ই আপনার লোক। তাহাদিগকে আনাইয়া আমাদের এখানে বন্দী করিয়া না রাখিলে কেমন করিয়া কার্যাসিদ্ধি হইবে?” তখন ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর মামুদ ছফিকে বলিলেন, “মীর্জা মুক্তি করিয়া তাহাদিগকে আনাইলে তাহারা এখানে আসিবে; আমার কথায় তাহারা কেন আসিবে?” তখন মামুদ ছফি ঘনশ্যাম ঠাকুরকে বলিলেন, “তুমি বন্ধুভাবে তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাও এবং বল যে মুবাদ, বেগকে আনা হইয়াছে; সে মহাবাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে জন্তু পায়, সে

আমার আশ্বাসে ভরসা করে না ; তজ্জন্তু তোমরা দুইজন আমাদের এখানে আইস । তোমাদের সঙ্গে আমিও মুরাদ্ বেগকে লইয়া মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব এবং সেই সঙ্গে আমাদের লোকেরাও মহারাজের নিকট গিয়া, আমি মুরাদ্ বেগকে আশ্বাস দিয়াছি, একথা মহারাজকে বলিবে । এই কথা বলিয়া তুমি তাহাদের নিকট খবর পাঠাইয়া দেও এবং কি কারণে তাহাদিগকে ডাকাইয়াছে তাহাও রাজাকে জানাইয়া খবর পাঠাইবা ।” তখন মুরাদ্ বেগ বলিল, “মীর্জা সাহেব ভাল কথাই বলিয়াছেন ; বড়ঠাকুর ঐরূপে কাজ করিলেই ভাল হইবে ।”

তারপর ঘনশ্যাম ঠাকুর ও মামুদ ছফি উভয়ে যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন “তোমরা আমাদের এখানে আইস তোমাদের সঙ্গে আমরা একত্র হইয়া মুরাদ্ বেগকে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব ।” এইরূপে যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিবের নিকট খবর পাঠাইয়া দিলেন এবং কি কারণে তাহাদের দুইজনকে ডাকা হইয়াছে তাহাও রাজাকে জানাইয়া খবর পাঠাইলেন । তারপর ঘনশ্যামের লোক গিয়া যুবরাজকে এই খবর জানাইলে তিনি বলিলেন, “আজ একাদশীত্রত করিয়াছি, আমি যাইতে পারিব না” এবং কোতোয়াল মুছিবকে বলিলে তিনি বলিলেন “আমার শরীর ভাল না, আমি যাইতে পারিব না” । তাহারা দুই জনেই গেলেন না । ঐ লোক ফিরিয়া আসিয়া মামুদ ছফি ও বড়ঠাকুরকে এই সংবাদ জানাইল । তাহারা দুই জনেই আসিল না দেখিয়া মামুদ ছফি বড়-ঠাকুরকে বলিলেন, “তাহাদের দুইজনকেই খবর দেওয়া হইল, তাহারা আসিল না । দেশের লোকজনদের বশ করা হইল না । আমি একাকী তোমাকে রাজ্য করিতে পারিব না । তাহাছাড়া আমার উপর মীর মুরাদের এরূপ আদেশ নাই । আমি তোমার এই কাজ করিতে পারিব না ।” তখন ঘনশ্যাম ঠাকুর মামুদ ছফিকে বলিলেন, “আমি তোমার উপরই সমস্ত নির্ভর করিয়া আছি, এখন তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ কর তবে আমার বধের কারণ তুমিই হইবে । তাহাছাড়া তোমার ধর্ম ও হানি হইবে । আমি

মীর মুরাদের জন্ত পাঁচ হাজার টাকা দিব। তুমি মীর মুরাদের কথা ভাবিয়া একটুও বিচলিত হইও না।” তারপর মামুদ ছফি বলিলেন, “তাহা হইলে তোমার দেশের দুই চারিজন প্রধান লোক সঙ্গে লও।” ঘনশ্যাম ঠাকুর বলিলেন, “ভালই হইল, আমাব ভাই চন্দ্রমণি ঠাকুর ও জয়সিংহ কাচোনকে আমার সঙ্গে লইব।” তখন মামুদ ছফি বলিলেন, “এইকপ দুই চারিজন সঙ্গে থাকিলে মীর মুরাদকে বুঝাইতে সুবিধা হইবে।” এইকপ পবামর্শ করিয়া তাহারা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিবের সৎ পরামর্শ

এদিকে যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব ঘনশ্যাম ঠাকুরের ডাকে না গিয়া রাজ্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বসিলেন, “মানবা পূর্বের মহারাজকে যে-সব কথা বলিয়াছি তাহা মহারাজ গ্রাহ্য করেন নাই। পূর্বাপর নিয়ম আছে যে হাতিধরার জায়গা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই দিনই মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হয়। এক্ষণে ঘনশ্যাম ঠাকুর এখানে না আসিয়া নদীর উপর পাড়ে মোগলের সহিত একজোট হইয়া অবস্থান করিতেছে। আমাদের দিগকে তাহার ওখানে যাওয়ার জন্ত বলিতেছে। পূর্বের কখনও একপ নিয়ম ছিল না। আমরা তাহার জায়গায় গেলে পর সে আমাদের কয়েদ করিয়া রাখিবে। মহারাজ আদেশ করিলে এখনও আমরা একটা উপায় করিতে পারি।” তখন রাজা বলিলেন, “তোমরা একপ অমুচিত কথা কেন বলিতেছ? এদিকে ঘনশ্যাম আমাদের বলিয়া পাঠাইয়াছে যে মুরা বেগদ

আমার নিকট অপরাধ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল ; এমন কি সে শাস্তি পাইবার ও উপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে শাস্তি দেওয়া উচিত হয় না। এই রকম ভাল মানুষ দেশে দুই-চারি জন থাকার দরকার। মুরাদ বেগের মনে বড়ই ভয় হইয়াছে। এই জন্ত ঘনশ্যাম বলিয়া পাঠাইয়াছে যে সে যুবরাজ ও কোতোয়াল মুহিবের সঙ্গে একত্রে আসিয়া আমার নিকট মুরাদ বেগের অপরাধের জন্ত মার্জনা মঞ্জুর করাইবে। এই কথা ঘনশ্যাম মনে স্থির করিয়া তোমাদের দুই জনকে তাহার নিকট ডাকিয়া পাঠাইয়াছে এবং সে নিজে আসে নাই। ঘনশ্যাম এই সমস্ত কথা আমাকে জানাইয়াছে। তোমরা কোনও সন্দেহ করিও না। তোমরা তাহার কাছে যাও।” তা’রপর যুবরাজ ও কোতোয়াল মুহিব বলিলেন, “অমর! বার বার যে সব কথা মহারাজকে জানাইয়াছি তা’র মহাবাজ ভাল মনে করেন নাই। ঘনশ্যাম ঠাকুর মোগলের যুক্তিতে এই কৌশলজাল সৃষ্টি করিয়াছে। মহারাজ দৈব-দোষে এসব কথা বিশ্বাস্তে পারিতেছেন না। আমরা অবশ্য রোদন করিলে কি ফল হইবে!”

এই কথা বলিয়া যুবরাজ ও কোতোয়াল মুহিব অসন্তুষ্ট চিত্তে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরিয়া গেলেন। তা’রপর কোতোয়াল মুহিব তাহার স্ত্রী অর্পাৎ রাজার ভগ্নীকে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, “আমরা অনেক করিয়া রাজাকে বুঝাইলাম কিন্তু রাজা আমাদের কথা শুনিলেন না। তুমি গিয়া রাজাকে বুঝাইয়া বলিবা যে ঘনশ্যাম ঠাকুর রাজাকে সবাইয়া দিয়া নিজে রাজা হইবে এবং আমাদেরকেও সব কার্যে মহারাজ যেমন এবিধে নিশ্চয় করিয়া জানিয়া রাখেন।” তা’রপর রাজার ভগ্নী রাজার নিকটে গিয়া রাজাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন।

তারপর রাজা তাহার ভগ্নীকে বলিলেন “তুমি মেয়েলোক কিছুই জান না। তোমার স্বামী তোমাকে যেরূপে বুঝাইয়াছে তুমি সেই রূপে বুঝিয়াছ। তুমি আমার যেরূপ সরলা ভগ্নী.....

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিব ঘনশ্যামের নিকট গেল

[মূল পুথিতে এই জায়গায় একটি পাতা নাই। ঐ পাতাটি না থাকিলেও ঘটনার ধারাবাহিকতা পরিষ্কার বুঝা যায়। রত্নমাণিক্য রাজা তাঁহার ভাই ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের কোনও ছুরাভিসন্ধি আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। রাজা তাহার ভগ্নীর কথাও শুনিলেন না, পরম হিতাকাঙ্ক্ষী যুবরাজ হুজুয় সিংহ এবং কোতোয়াল মুছিব রাজহুর্লভ নারায়ণের পরামর্শও ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাজার আদেশ অহুসারে যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের নিকট যাইতে বাধ্য হইলেন।

মূল পুথির নির্ঘণ্টে ঐ হারাইয়া যাওয়া পাতা সম্পর্কে এই রূপ লিখিত আছে যে “যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিব ঘনশ্যামের নিকট গেল।”
শ্রী ত্রিপুর চন্দ্র সেন, ১লা জুন, ১৯৬৪ ইং]

“.....মিত্র সহ মহারাজের নিকট অপরাধের ক্ষমা চাহিলেই ভাল হইবে বলিয়া মনে করি।” তারপর মুরাদ বেগ বলিল, “যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিবের আদেশ আমার সর্ব্বদাই পালনীয়। যাহাতে আমার প্রাণরক্ষা হয় আপনারা তাহাই করুন। আমার অধিক আর কি বলিবার আছে!” তখন যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিব বলিলেন ‘তুই মনের আবেগে অগ্নায় কথা প্রকাশ করিয়াছিস। তোর এমন বিরুদ্ধ কথার জন্ত আমরা রাজার নিকট কথা বলিতে সংশয় বোধ করিতেছি। তবুও তোর জন্ত আমরা বড়ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া রাজার নিকট বলিব।

তারপর মামুদ ছফি বলিলেন, “তাহারা ভালই বলিয়াছে।” তখন

ঘনশ্যাম ঠাকুর বলিলেন, কাল সকলে একত্র হইয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।” তাহারা এই রূপে ছল করিয়া রাত্রি করাইল।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ঘনশ্যামের হাতে কোতোয়াল মুছিব বন্দী

তারপর ঘনশ্যাম ঠাকুর কোতোয়াল মুছিবকে বলিলেন, “আজ তুমি আমার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করিয়া এখানে থাকিবা।” এই বলিয়া কোতোয়াল মুছিবের হাতে ধরিয়া ভিতরে নিয়া গিয়া তাহাকে শৃংখলাবদ্ধ করিলেন।

মামুদ ছফি ও যুবরাজ তাহাদের নিজ নিজ জায়গায় বসি রহিলেন। তখন যুবরাজ বিপজ্জনক অবস্থা দেখিয়া মামুদ ছফিকে আত্ম সমর্পন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মামুদ ছফিও গোপন ইঙ্গিতে কিছু বলিলেন। সেই সময়ে ঘনশ্যাম ঠাকুর অস্তুরাল হইতে বলিয়া পাঠাইলেন “যুবরাজ আজ আমাদের সঙ্গেই থাকুক।” তখন যুবরাজ নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়া মামুদ ছফির নিকট আত্মসমর্পন করিয়া বলিলেন, “আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পন করিলাম। তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কর এবং আমার যুবরাজের চাকরিও বহাল রাখ। আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা দিব।” তখন মামুদ ছফি বলিলেন, “আমি তোমাকে কৌশল করিয়া রক্ষা করিব, ইহাতে তুমি একটুও সন্দেহ করিও না।” তখন যুবরাজ বিশেষ করিয়া মামুদ ছফিকে বলিলেন, “আজ আমাকে আমার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেও, তাহা হইলে আমার মনের সন্দেহ দূর হইবে।” মামুদ ছফি বলিলেন, “বেশ, দেখ আমি

কি করিতে পারি।” তারপর মামুদ ছফি ঘনশ্যাম ঠাকুরকে বলিয়া পাঠাইলেন, “যুবরাজ এখানে থাকিলে ভাল হইবে না, যুবরাজ ঘরে যাক। তাহাদের দুই জনকেই এখানে রাখিলে রাজার মনে সন্দেহ হইবে।” ইহাতে ঘনশ্যাম ঠাকুর বলিয়া পাঠাইলেন, “মীর্জা যদি ভাল মনে করেন তবে তাহাই করুন, তবে যুবরাজকে ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। আগামীকাল পুনরায় এই ঘোড়সওয়ারেরা যুবরাজকে এখানে নিয়া আসিবে।” তখন মামুদ ছফি দশজন ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে দিয়া যুবরাজকে তাহাব বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন। মামুদ ছফি ঘোড়সওয়ারগণকে বলিয়া দিলেন, “আজ তোরা যুবরাজের বাড়ীতে থাকিস এবং কাল প্রাতঃকালে যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া এখানে লইয়া আসিবি।” তারপর সেই ঘোড়সওয়ারগণের সঙ্গে যুবরাজ নিজ বাড়িতে ফিরিলেন। ঘনশ্যাম রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন “কোতোয়াল মুন্সিবকে আমাদের এখানে রাখিয়াছি, আজ আমরা দুইজন এখানে আনন্দে কুটাইয়া কাল মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব” এবং এইরূপে অপর একটি সংগত ভদ্রীক [কোতোয়াল মুন্সিবের স্ত্রী] ও পাঠাইয়া দিলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

যুবরাজ গোপনে রাজাকে সমস্ত বিষয় জানাইল

যুবরাজ ঘনশ্যাম ঠাকুরের জায়গা হইতে নিজ ঘরে ফিরিলেন এবং সঙ্গে যে সব ঘোড়সওয়ার আসিয়াছিল তাহাদের খাওয়ার জন্য সিঁধা ও আবশ্যকীয় জিনিসাদি দিলেন। তারপরে ছদ্মবেশ ধরিয়া একটি চাকর সঙ্গে লইয়া রাজার নিকট গেলেন। পরে রাজার নিকট খবর পাঠাইলে রাজা তাহাকে অন্ধরের ভিত্তবে নেওয়াইলেন। রাজা তাহার এই পোশাক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

“তুমি এইরূপ বেশ ধরিয়া কেন আসিয়াছ ?” যুবরাজ বলিলেন, “মহারাজকে কি বলিব ! আমার শেষসময় উপস্থিত হইয়াছে । কোতোয়াল মুন্সিব ও আমি বড়ঠাকুরের নিকট গিয়াছিলাম । ঘনশ্যাম ঠাকুর মুরাদ বেগকে মহারাজের নিকট উপস্থিত করার কথা লইয়া আলাপ করিতে করিতে ছল করিয়া রাত্রি করিল । পরে কোতোয়াল মুন্সিবকে ভিতরে লইয়া গিয়া হাতকড়ি লাগাইল এবং আমাকেও বন্দী করিল । তখন আমি মামুদ ছফিকে দশ হাজার টাকা দিব স্বীকার করিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়াছি । আমি ঐ টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করি সত্ত্বেও ঘোড়সওয়ার সঙ্গে দিয়া আমাকে আমার বাড়ীতে আসিতে অনুমতি দিয়াছে । ঐ ঘোড়সওয়ারেরা আমাকে পাহারা দিয়া রাখিয়াছে । কাল প্রত্যুষে তাহারা আবার আমাকে ঘনশ্যামের নিকট লইয়া যাইবে । আমি ভয়বশে ধরিয়া পিছনের দরজা দিয়া লুকাইয়া মহারাজকে সব কথা বলিতে আসিয়াছি । আমি যে লুকাইয়া এখানে আসিয়াছি তাহা ঐ ঘোড়সওয়ারেরা টের পায় নাই । আগামীকাল ঘনশ্যাম ঠাকুর মহারাজকে সরাইয়া দিয়া নিজে রাজা হইবে । সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে আমাকে ও কোতোয়াল মুন্সিবকে প্রাণে বধ করিবে । এখনও মহারাজ আদেশ দিলে উপায় করিতে পারি । আমাদের দেশের লোকজনের মহারাজের প্রতি অনুরাগ আছে । আমরা যদি হাদিরিবাচ্চ বাজাই তাহা শুনিয়া দেশের লোকজন আসিয়া আমাদের সঙ্গে একত্র হইবে । তারপর আমরা দুর্গের ভিতরে সতর্কতার সহিত অবস্থান করিলে তাহারা আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না এবং পরে কোতোয়াল মুন্সিবকেও উদ্ধার করা যাইবে এবং ঘনশ্যামকে ধরা সম্ভব হইবে । আমাদের কৃতকার্যতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই । এখন মহারাজের আদেশ পাইলেই হয় ।”

তখন রত্নমণিক্য রাজা বলিলেন “তোমরা কিছুই বোঝনা, রত্নকে সর্প মনে কর । ঘনশ্যাম আমাকে জানাইয়াছে যে সে কোতোয়াল মুন্সিবকে তাহার কাছে রাখিয়াছে এবং আজ সেখানে আনন্দে কাটাইয়া আগামীকাল তাহারা আমার সঙ্গে দেখা করিবে । এখন তোমরা কাটাকাটি করিতে চাও ।

ঘনশ্যাম আমার ভাই হয়। সে সমস্ত রকমে যেগ্যাশুক্রব। বিনা দোষে তাহাকে বধ করিলে আমার কি সুখ হইবে! ত হা ছাড়া শত্রুহত্যার পাপ হইবে এবং লোকসমাজেও আমার নিন্দা থাকিয়া যাইবে। পূর্বেও তোমরা এইরূপ কুপরামর্শ দিয়া চম্পকরাইকে বধ করাইয়াছ। চম্পকরাই মারা যাওয়ার পর হইতেই মোগলেরা দেশের বত অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। এইরূপ অর্থোক্তিক কার্যে আমি সাহায্য দিবনা। তোমরা ও আমাকে এইরূপ অশ্রায় কাজ করিতে বলিও না।” তখন যুবরাজ বলিলেন, “আপনি রামমাণিক্য রাজার পুত্র, তাহা ছাড়া আপনি সাতাশ বৎসব রাজহও করিয়াছেন তথাপি শত্রুর কুচক্রান্ত বৃদ্ধিতে পারিলেন না। আপনার ও আমার জন্মের মতন ইহাই শেষ দেখা হইল জানিবেন।” এই কথা বলিয়া যুবরাজ অসন্তুষ্ট চিত্তে নিজ বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন।

ষড়বিংশ অধ্যায়

ঘনশ্যাম রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই বলিয়া রওনা হইল

পরের দিন ঘনশ্যাম ঠাকুর চন্দ্রমণি ঠাকুরকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, “তুমি আমার সহায় হও, আমি রাজা হইলে তোমাকে যুবরাজ করিব।” তখন চন্দ্রমণি ঠাকুর বলিলেন, “ভাল কথা, আপনি যে আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব।” তারপর ঘনশ্যাম জয়সিংহ নারায়ণ কার্কোনকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, “তোমার কন্যাটিকে আমাকে দিবে, আমি তাহাকে বিবাহ করিয়া মহারাজ্য করিব। তুমি আমার সহায় হও।” তখন

জয়সিংহ নারায়ণ কার্কেন বলিলেন, “ঠাকুর সাহেব যাহা আদেশ করিবেন আমি কি তাহা না করিয়া পারি !” তারপর ঘনশ্যাম মামুদ ছফিকে বলিলেন, “চল্লমণি ঠাকুর এবং জয়সিংহ কর্কেন আমার সহায় হইয়াছে”। ইহার কতক্ষণ পরে ঘোড়সওয়ারেরা যুবরাজকে ঘনশ্যামের নিকট লইয়া আসিল।

তারপর ঘনশ্যাম ঠাকুর ব্রাহ্মণ এবং দৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়া ঘনশ্যামকে যাত্রা করাইল। ঘনশ্যাম ঠাকুর রাজার সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত রওনা হইলেন। তাহার সঙ্গে দেশের লোক-জনেরা আসিল। বিদেশ হইতে নবনিযুক্ত ঘোড়সওয়ার অনুমান দুইশত-জন এবং হিন্দুস্থানী তীরন্দাজ অনুমান সাত হাজার ও এইসঙ্গে আসিল। ঘনশ্যাম রওনা হওয়ার সময় অনুমান কুড়িজন ঘোড়সওয়ার মামুদ ছফির সঙ্গে দিয়া যুবরাজ ও কোতোয়াল মুজিবকে পাহারার অধীনে আটক অবস্থায় বাসায় রাখিয়া আসিলেন। ঘনশ্যাম রাজা হইবার জন্ত রওনা হইয়া আসিবার সময়ে কোমরের দুই ধারে দুইটি তরোয়াল ও জামিয়ার; পিঠে একটি ঢাল, তীর, ধনুক, ছোকর এবং হাতে একটি বঁড়শ লইয়াছিলেন। একটি তুর্কী ঘোড়াতে চড়িয়া লোকলস্কর সঙ্গে লইয়া গোমতী নদী অতিক্রম করিয়া এপাড়ে আসিলেন। ঘনশ্যাম সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে শুনিয়া রাজা অন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন। এদিকে ঘনশ্যাম ঠাকুর সোনারতুয়ারী ঘরের নিকট আসিলেন। সেই সময়ে ঘনশ্যামের লোক তাহার নিশান লইয়া গিয়া সিংহাসন ঘরের সম্মুখে গাড়িল। তখন রাজার সেবক ছল্লভ নারায়ণ বলিল, “দেখ, বড়ঠাকুরের নিশান আনিয়া মহারাজার সিংহাসনঘরের সম্মুখে গাড়িয়াছে! পূর্বে কখনও একুপ নিয়ম ছিল না।” তখন রাজা বলিলেন—“ইহাত বড়ই অশ্রায় কথা হইল। এখন কি করা যাইবে? যুবরাজ ও কোতোয়াল মুজিব ইহাদের সহিত আছে কি?” তখন ছল্লভ নারায়ণ বলিল, “তাহাদের দুইজনকে দেখি নাই।” এমন সময় ঘনশ্যামের প্রেরিত এবং বাঙ্গালা দেশ হইতে নবনিযুক্ত পীতাম্বর হাজারি অনুমান কুড়ি জন হিন্দুস্থানী সঙ্গে লইয়া সিংহাসনঘরে

উঠিয়া রাজাকে বলিল, “তুমি সিংহাসন হইতে নামিয়া আস। ঘনশ্যাম ঠাকুর রাজা হইয়াছে।” তখন রাজা বলিলেন, “ঘনশ্যাম আমার ভাই হয়, সে কেন একপ অধর্মের কাজ করিবে? তোমরা কেন একপ অত্যাচার কথা বলিতেছ?” তখন পীতাম্বর হাজারি রাজার হাত ধরিয়া তাকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া আনিল। সেই সময়ে রাজা বলিলেন— “আমি রাজা, আমার পা মাটি স্পর্শ করিলে দেশ উচ্ছন্ন যাইবে।” তাবপর তাহারা ঘনশ্যামের ব্যবহারের একখানা পালকি আনিয়া উহাতে রাজাকে উঠাইয়া ঘনশ্যামের বাড়ীতে লইয়া গেল। রাজাকে লইয়া গিয়াছে শুনিয়া রত্নমাণিক্যের পত্নীগণ অন্তঃপুরে থাকিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজার সেবকেরা ও রাজার সঙ্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ত্রিপুরার সিংহাসনে ঘনশ্যাম বা মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা

তারপর ঘনশ্যাম আসিয়া সিংহাসনে বসিয়া রাজা হইলেন। এইকালে ১৬৩৪ শকাব্দ-বৈশাখ মাস-২৯ তারিখ-সোমবার-ত্রয়োদশী তিথিতে একদণ্ড বেলা থাকিতে ঘনশ্যাম রাজা হইলেন। চোন্‌তাই দৈবজ্ঞকে আনাইয়া ঘনশ্যাম মহেন্দ্র মাণিক্য নাম লইলেন। ব্রাহ্মণেরা দুর্বা ছিটাইয়া মঙ্গল-বাক্য উচ্চারণ করিলেন। তিনবার তোপ দাগান হইল এবং অস্ত্রাস্ত্র অনেক রকমের বাজ বাজান হইল। তারপর রত্ন মাণিক্য রাজার স্ত্রী ও পরিবারের অন্তঃস্থ লোকদিগকে রত্নমাণিক্যের নিকট লইয়া যাওয়া হইল এবং ঘনশ্যামের পরিবারবর্গকে রাজবাড়ীতে আনুল হইল। মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা রত্নমাণিক্যের খাওয়ার ও শোয়ার এবং প্রত্যেক দিনের প্রয়োজনীয় আয়োজনসমুদয় পূর্বের

মতই দিলেন। বড়মাণিক্যের পরিবাবেব স্ত্রীলোকদেব জ্ঞাত ও পূর্বের মতনই খাওয়াখাকার যোগান দেওয়াইলেন। মহেন্দ্র মাণিক্য বাজা নগরে পাঠাবা বসাইয়া সাবধানে থাকিতে লাগিলেন। কোতোয়াল নগরে ঢোল দিয়া সবলকে জানাইয়া বলিলেন যে বড়মাণিক্য বাজাকে সবাইয়া দিয়া মহেন্দ্র মাণিক্য বাজা হইয়াছেন এবং এখানে দেশের লোকজন যেন মনে কোন সন্দেহ না থাকে।

পর দিন মহেন্দ্র মাণিক্য বাজা মামুদ ছফি ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, “চন্দ্রমণি ঠাকুরকে যুবরাজ নিযুক্ত ববাই উক এবং কোতোয়াল মুছিব ও যুবরাজকে বধ করা যাক।” ইহাতে মামুদ ছফি বলিলেন, “যুবরাজকে মাঝে মৌলুমবাদ বাগ করিবেন। তাহাছাড়া যুবরাজ তোমার বাড়িই হয়। তাহাকে বধ করিলে লোকের নিকটে তোমার দুর্গাম থাকিয়া যাইবে। যুবরাজ আসলে ভাল মানুষ। সে পূর্বের যেমন বড়মাণিক্যকে আবোধনা করিত তোমাকে ও সেইরূপ করিবে। তাহাকে পূর্বের স্থায় যুবরাজের চাকরিতে থাকিতে দেও। যুবরাজের জ্ঞাত কোন ও সন্দেহ করিও না। আর কোতোয়াল মুছিবকে প্রাণে বধ করিলে কি লাভ হইবে? তাহার নিকট তোমার ভগ্নী ও বিবাহ দিয়াছ। তাহাকে চাকরি হইতে বরখাস্ত করিলেই ভাল হয় বলিয়া মনে করি; তথাপি তোমার মনে যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই কর।” তখন মহেন্দ্র মাণিক্য বাজা বলিলেন, “কোতোয়াল মুছিবের কাবণে অতীতে অনেক অশান্তি ভোগ করিয়াছি। তাহাকে বধ করা হইবে আর তোমার কথাব উপর নির্ভর করিয়া যুবরাজকে তাহার চাকরিতে থাকিতে দেওয়া হইবে।” মামুদ ছফি বলিলেন, “তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই কর।” মহেন্দ্র মাণিক্য বলিলেন, “তুমি গিয়া যুবরাজকে দশজন ঘোড়সওয়ার দিয়া পাহারা দিয়া তাহার বাড়িতে এবং কোতোয়াল মুছিবকে শিকলপরা অবস্থায় আমার এখানে পাঠাইয়া দিবা।” তারপর মামুদ ছফি নিজের বাসায় আসিয়া কোতোয়াল মুছিবকে শিকলপরা অবস্থায় মহেন্দ্র মাণিক্যের নিকট এবং যুবরাজকে দশটি ঘোড়সওয়ার পাহারা দিয়া ও তাহাকে

অনেক ভরসা দিয়া তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। পরে রত্নমাণিক্য রাজাকে মহেন্দ্র মাণিক্য পূর্ব্বে যে বাড়ীতে থাকিতেন সেই বাড়ীর ভিতবে নিয়া গিয়া পাহারা দিয়া রাখা হইল। সেখানে রত্নমাণিক্য রাজা একবেলা নিরামিষ খাইয়া ইহুদেবতাব আরাধনা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে পীতাম্বর হাজারি যে হাত দিয়া রাজ্যের হাতে ধরিয়া রাজাকে লইয়া গিয়াছিল রাত্রিতে তাহার সেই হাত ফুলিয়া জ্বর হইয়া তিন দিনের মাথাখ মারা গেল। মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা হইয়া চারিদিন গত হইলে নিজ নামে মোহর গড়াইলেন এবং সেইদিন কোতোয়াল মুছিবেক কাটিলেন।

কোতোয়াল মুছিবের স্ত্রী অথাৎ রত্নমাণিক্য রাজ্যের ভগ্নী তাহার স্বামীকে কাটিয়াছে শুনিয়া সহমরণ কামনা করিয়া মহেন্দ্র মাণিক্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “আমি সহমরণে যাইতে চাই, মহারাজের আদেশ প্রার্থী”। মহেন্দ্র মাণিক্য বলিলেন, “তুমি রত্নমাণিক্য রাজ্যের ভগ্নী এবং আমারও ভগ্নী হও। তুমি সহমরণে যাইবে কেন?” তখন রাজ্যের ভগ্নী বলিলেন, “স্বামীর অভাবে আমার আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? আমাকে আর বাধা দিও না।” তারপর রাজা মহেন্দ্র মাণিক্য একশত টাকার রূপার আধুলি, সিকি, দোআনি, আনি ও আধআনি এবং কাপড় একজোড়া দিয়া বিদায় দিয়া বলিলেন, “ভাল কথা, তোমার সহমরণে যাওয়ার ইচ্ছা হইয়া থাকিলে যাও”। তখন রাজ্যের ভগ্নী বলিলেন, “যদি মহারাজ অনুমতি দেন তবে ইহজন্মের মত রত্নমাণিক্য দাদাকে একবার দেখিয়া যাইতে চাই।” মহেন্দ্র মাণিক্য বলিলেন, “বেশ, তাহাকে দেখিয়া যাও।” তারপর রাজ্যের ভগ্নী রত্নমাণিক্যের নিকট গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাদিয়া বলিলেন “গৌসাই মহারাজ, আমার স্বামীকে মহেন্দ্র মাণিক্য কাটিয়াছে। আমি সহমরণে যাওয়ার জন্ত আপনার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।” তখন রত্নমাণিক্য বলিলেন, “তুমি রামমাণিক্য রাজ্যের কন্যা এবং আমারও ভগ্নী, তোমার এরূপ ধর্ম্মকুর্য্যো মতি হইয়াছে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। তুমি যদি তোমার স্বামীর সঙ্গে সহমৃত্যু হইতে পার তবে

তোমার স্বামীর কুল এবং পিতার কুল উভয়ই উদ্ধার হইবে। এই কথা সত্য জানিয়া সকলের মায়া-মোহ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া সহমৃত্যু হও। তোমার পশ্চাতে আমাকেও মহামায়া পাঠাইতেছেন।” এই কথা বলিয়া রত্নমাণিক্য ভগ্নীকে বিদায় দিলেন। রত্নমাণিক্যের ভগ্নী তাহার স্বামীর মৃতদেহ মচায় করিয়া এবং নিজেও তাহাতে উঠিয়া গোমতী নদীর পড়ে গেলেন। মহেন্দ্র মাণিক্য চিত্ত প্রস্তুত করাইয়া দিলেন এবং ব্রাহ্মণও পাঠাইয়া দিলেন। রত্নমাণিক্যের ভগ্নী স্নান করিয়া উঠিয়া রাজার দেওয়া আবুলি, সিকি, দোআনি, একআনি ও আধআনি উপস্থিত লোকদের মধ্যে বিতরণ করিলেন। তাহার গায়ে যে সমস্ত অলঙ্কার ছিল তাহাও বিতরণ করিলেন। তারপর ব্রাহ্মণেরা নিয়ম মতে দাহ করাইল। তারপর রাজা কেতেয়াল মুহিবের সমস্ত জিনিসপত্র হিসাব করিয়া নিজে লইলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

রাজার ঘরে আগুন লাগিল

সেই দিন মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা আমাদিগকে দরবারে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ছুইটি সোড়া পাঠাইয়া আমাদিগকে নেওয়াইলেন। দোল মণ্ডপে আমাদের বসিবার জায়গা দেওয়া হইল। সেই দিন নূতন নিযুক্ত ও বাংলা দেশ হইতে আগত এবং দেশের লোক মিলাইয়া প্রায় আঠার হাজার লোক জমা হইয়াছিল। তারপর রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ সোনারত্মারী ঘরের মাথায় আগুন লাগিল। রাজা ঐ আগুন নিবাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা সেই আগুন নিবাইতে পারিল না।

তারপর রাজা সিংহাসন হইতে উঠিয়া আসিয়া বিষ্ণু মন্দিরের সম্মুখে চৌচালা ঘরে বসিলেন। সেইদিন মহেন্দ্র মাণিক্য রাজার পরনে ছিল সোনালী কাজকরা গুজরাটী তসরের জামা, সোনালী কাজ করা জিরা, রূপালী গোছপেছ, সোনালী পটুকা এবং বিংখাবের তৈরী ইজার। সাদা শাল একখানা তাহার কাঁধের উপর রাখা ছিল। পাগড়ির উপরে সোনার তরোলা দুইটি এবং হীরাখচিত কলগা দুইটি গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং মুক্তার মালা দুইপেচ পাগড়ির উপরে পরিয়াছিলেন। কানে মুক্তা, গলায় হীরা ও অশ্ব পাথরখচিত কণ্ঠাভরণ এবং দুগ্‌দুগীর সহিত মুক্তার মালা দুইপেচ গলা হইতে নাভি পর্যন্ত ঝুলিয়া পরিয়াছিলেন। বাহ্যতে পাথরখচিত বাজুবন্ধ, কোমরে সোনার হাতলযুক্ত খজুর একটি এবং পিঠে সোনারচোখ বসান ঢাল একটি লইয়াছিলেন। সোনার হাতলযুক্ত তরোয়াল একটি খাপ হইতে খুলিয়া লইয়া সাবধানে হাতে করিয়া বসিয়াছিলেন।

সেই আগুন গিয়া রাজা যে ঘরে থাকিতেন সেই ঘরে লাগিল। রাজার ঘরে আগুন লাগিবার কথা শুনিয়া মামুদ ছফি একটি তুর্কীঘোড়াখ চড়িয়া তিনজন অশ্বরোহী সঙ্গে করিয়া তাড়াতাড়ি সেই আগুনের কিনরা দিয়া আশিয়া রত্নমাণিক্য যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরে আসিলেন এবং রত্নমাণিক্যকে বলিলেন, “মহারাজা, তুমি ঘরের ভিতরে বসিয়া আছ কেন? রাজার ঘরে আগুন লাগিয়াছে; সেই আগুনে তুমি যে ঘরে আছ তাহা পুড়িবে। তুমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আস। তোমার জ্ঞানই আমরা এখানে আসিয়াছি।” রত্নমাণিক্য বলিলেন, “মীর্জা, আমরা সেই ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছি বলিয়াই তাহাতে আগুন লাগিয়াছে। আমরা যে ঘরে আছি তাহাতে আগুন আসিতে পারে না, ইহাতে তুমি একটুও সন্দেহ করিও না।” তখন মামুদ ছফি বলিলেন, “আগুনের বিশ্বাস কি আছে? তুমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আস।” তখন একটি পালকিতে তুলিয়া রত্নমাণিক্যকে বট-গাছের তলে লইয়া যাওয়া হইল। তখন মামুদ ছফি

রত্নমাণিক্যকে বলিলেন, “তোমার পরিবারবর্গের লোকদেরও এখানে নিয়া আসা হউক”। রত্নমাণিক্য বলিলেন, “তাহাদিগকে আনাইবার প্রয়োজন নাই। তাহারা যে ঘরে আছে তাহাতে আশ্রয় লাগিবে না তুমি আমার এই কথার সত্যতা প্রমাণ পাইবা”। রত্নমাণিক্য মামুদ ছফিকে আরও বলিলেন, “যতদিন আমার রাজ্য ভোগ ছিল তাহা করিয়াছি। আমি আর রাজ্য হইতে চাহি না। আমাকে দুইজন রাক্ষস দিলেই হয়। আমি ভাগ্যবত, তত্ত্ব আর পুৰাণ শুনিয়া ঈশ্বরের আরাধনায় দিন কাটাইব। আমি পবলোকে মজল চাই। মীর্জা, তুমি দর্শের দিকে তাবাইয়া আমার জগা এইটুকু করিয়া দেও।” তখন মামুদ ঢকি বলিলেন, “ভাল কথা, আমি রাজ্যকে এই কথা বলিব। মহারাজ, এবিষয়ে তুমি আমার উপরে নির্ভর করিতে পার।”

সেই আশ্রমে রাজার সকল ঘর পুড়িল। রাজভাণ্ডারে যাহা কিছু জিনিসপত্র ছিল সেগুলিও পুড়িয়া গেল। সেই সময়ে প্রচণ্ড বাতাস বহিতছিল। জিনিসপত্র কিছুই রক্ষা করিতে পারা গেল না। তখন আমাদিগকে আমাদের বাসায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেদিন আমাদিগকে দরবারে উঠন হইল না। যে ঘরে রত্নমাণিক্যকে রাখা হইয়াছিল সেই ঘরটি পুড়িল না। পরে মামুদ ছফি রত্নমাণিক্যকে তাহার ঘরে রাখিয়া নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। সেই রাত্রিতে মহেন্দ্র মাণিক্য তাম্বুকানাতের ঘর বানাইয়া তাহাতে বাস করিলেন। রাজার সমস্ত জিনিসপত্র পুড়িয়া গিয়াছে শুনিয়া যুবরাজ খাওয়ার এবং শুইবার যাবতীয় জিনিসপত্র রাজাকে পাঠাইয়া দিলেন। রাজ্য অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক ও পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণের জগাও প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস যুবরাজ পাঠাইলেন। চন্দ্রমণি ঠাকুরও, রাজার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠাইয়া দিলেন। মহেন্দ্র মাণিক্য সমস্ত জিনিসপত্র পুড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট পাইলেন।

ঊষ্মনিঃশ অধ্যায়

গঙ্গানারায়ণী ধাই রত্নমাণিক্যকে বধ করিবার
জগৎ ঘনশ্যামকে পরামর্শ দিল

চন্দ্রমণি ঠাকুরের ধাই গঙ্গানারায়ণী নামে এক স্ত্রী ছিল। বড়ঠাকুর তাহাকে সঙ্গে রাখিয়া এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। বড়-ঠাকুর রাজা হইলে পর গঙ্গানারায়ণীকে সঙ্গে করিয়া বাজবাড়ীতে আনিয়া-
ছিলেন। এই ঘটনার দিন রাত্রিতে গঙ্গানারায়ণী মহেন্দ্র মাণিক্য রাজাকে বলিল, “মহারাজ, তোমার মনে অনেক কষ্ট হইলেও হইতে পারে। দিনের দুই প্রহর বেলায় সোনারত্বয়ারী উঁচু ঘরের মাথাশ আশুন লাগিয়া তোমার সম্মুখে তোমার পূর্বপুঙ্খ রাজাদের সজ্জিত সমস্ত জিনিসপত্র নষ্ট হইয়া গেল। মনে হয় এই আশুন অজুত এবং মাছুষের সৃষ্ট নয়। তাহাছাড়া রত্নমাণিক্য রাজ্যচ্যুত হওয়ায় দেশেব লোকজন বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছে বলিয়া শুনিতেছি। রত্নমাণিক্য বাঁচিয়া থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। এই কথা জানিয়া রত্নমাণিক্যকে আর বাঁচিতে দেওয়া উচিত হয় না।” তখন মহেন্দ্র মাণিক্য বলিলেন, “ভাল কথা বলিয়াছ, মামুদ ছফি একথা শুনিলে না জানি কি বলে?” গঙ্গানারায়ণীধাই বলিল, “এখন তুমি রাজা হইয়াছ। বুদ্ধি স্থির করিয়া তোমাকে কাজ করিতে হইবে। কেহ তোমার অমঙ্গলজনক কোন কথা বলিলে তাহা তুমি রক্ষা করিবে কেন? এখন তুমি চন্দ্রমণি ঠাকুরকে আনাইয়া বড়ঠাকুরের-পদ-দেও, মামুদ ছফির কথামত যুবরাজের

প্রতি বাগ বিসর্জন দিয়া তাহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া আপনার করিয়া লও, পাত্র, মিত্র, মন্ত্রী ও অন্যান্য সকলকে তোমার বশীভূত কর এবং এই পরামর্শ মুরাদ বেগকে গ্রহণ কর।” তখন মহেন্দ্র মাণিকা বলিলেন, “তুমি ভাল কথাই বলিয়াছ।”

দ্বিংশ অধ্যায়

রত্ন মাণিক্য রাজ্য বধ

পরের দিন মহেন্দ্র মাণিকা মুরাদ বেগকে আনাইয়া উত্তরকপে পরামর্শ করিলেন। মুরাদ বেগ বলিল, “মহারাজ ভাল বুদ্ধিই স্থির করিয়াছেন; মামুদ ছফিকে ও এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইবে।” রাজা বলিলেন, “আমর সকল কাজ তোর সাহায্যে সম্পন্ন হইয়াছে; তোর চেয়ে অধিক স্নেহের লোক আমার আর নাই। তুই নিজে গিয়া মামুদ ছফির কাছে আমার এই কথা বল।” এই কথা বলিয়া মুরাদ বেগকে বিদায় দিলেন। ইহার পরে মুরাদ বেগ মামুদ ছফির নিকট গিয়া এই সমস্ত কথা বলিল। মামুদ ছফি এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “আমি আমার পূর্বের অঙ্গীকার অনুযায়ী তাহাকে রাজ্য করিয়াছি। এখন রত্নমাণিক্যকে হত্যা করার জন্য মহেন্দ্র মাণিকা আমাকে যে জিজ্ঞাসা করিতেছে তাহাতে আমি পরামর্শ দিতে পারিবনা। আমার কাছে রত্নমাণিক্য বলিয়াছে যে সে আর রাজ্য হইতে চাহে না। দুইজন ব্রাহ্মণ পাইলে তাহাদের কাছে ভাগবত—পুরাণ শুনিয়া দিন কাটাইতে চাহে। এখন রত্নমাণিক্যকে বধ করিলে রাজ্য-

বধের প'প হইবে। লোক সনাজেও চূর্ণানি থাকিয়া যাইবে। আমি কিন্তু সে তাহাকে বধ করিতে বলিব? অত্যা বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছে সেগুলি করিলে ভালই হয়।” এই কথা বলিয়া ম'মুদ ছফি মুরাদ বেগকে পাঠাইয়া দিলেন। মুরাদ বেগ, আসিয়া মহেন্দ্র ম'ণিককে এই সকল কথা জানাইল। মহেন্দ্র ম'ণিকা মামুদ ছফির মত শুনিয়া মুরাদ বেগকে বলিলেন “এখন কি করা যায়? রত্নমাণিকাকে বধ করিতে মামুদ ছফি নিষেধ করিতেছে, অতএব না করিলেও অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। পূর্বের গোবিন্দ ম'ণিকাকে সবাইয়া দিয়া ছত্রমাণিক্য রাজা হইয়াছিলেন। তখন গোবিন্দ ম'ণিকা পলাতক অবস্থায় ছিলেন। পরে আবার গোবিন্দ ম'ণিকা ছত্রমাণিকাকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন; এখন রত্নমাণিক্য বাঁচিয়া থাকিলে আনন্দও সেইরূপ হওয়াব সম্ভাবনা রহিয়াছে।” তখন মুরাদ বেগ বলিল, “মহাবাজ ভালই চিন্তা করিয়াছেন। রত্নমাণিক্যের উপরে দেশের সমস্ত লোকজনের বড়ই অনুরাগ আছে। মামুদ ছফি ঢাকায় চলিয়া গেলে দেশের লোকজন রত্নমাণিকাকে বাজা করিবে এবং আপনাকে বধ করিবে। এই কথা নিশ্চয় জ'না অবশ্যই রত্নমাণিকাকে বধ করাই ভাল।” মহেন্দ্র ম'ণিকা রত্নমাণিকাকে বধ করাই স্থির করিলেন। মুরাদ বেগ নিজ বাসায় ফিরাইয়া আসিল।

পরের দিন রাজা যুবরাজকে আনাইলেন। দেশের বড় বড় এবং ভাল লোকেরা সকলে দরবারে আসিলেন। রাজা অনন্দ হইতে বাহিরে আসিয়া নিম্নমণ্ডলের সম্মুখের চৌচালা ঘরে বিহান করিয়া বসিলেন। তখন যুবরাজ আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা যুবরাজকে বলিলেন, “তুমি রত্নমাণিক্যের বড়ভাই এবং আমারও বড়ভাই হও। পূর্বের যেকোন রত্নমাণিক্যের মঙ্গলকামনা করিয়া যুবরাজের কাজ করিতেছিল। এখন আমার মঙ্গলকামনা করিয়া সেইরূপ করিতে থাক।” যুবরাজ বলিলেন, “আমি মহারাজের আদেশের চাকর, মহারাজ যাহা আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব।” অত্যা বড় লোকদিগকে রাজা বলিলেন, “এখন যার জন্য যে ভোগের ব্যবস্থা করেন সে তাহাই পায়। পূর্বের তোমরা যে ভাবে ছিলে এখন আমার মঙ্গলকামনা

কবিয়া সেই ভবে থা কিবা ” তখন তাহা বলিলেন, “ভলই হইয়াছে, মহাবাজ যে অশেষ কবিলেন অশেষ হই পলন কবিব ।” বাক্য তখন চন্দ্রানি বৃন্দকে বড়াবুকে পদ দিলেন এবং হৃদয়ে মজ্জের পাহারা ট্যাইয়া দিলেন । এবম্বব বাক্য সত্যতাগ ব লেন এবং তথাহোবাও নিজ নিজ বা ড়ে থি বসা গেল । বজা তন্দবে গিয়া মামুদ ছফিকে বলিয়া পাইলেন ‘বহুনা গিকাবে বহুনা কালো ভল হইবেনা । এ বিষয়ে মামুদ (মামুদ ছফি যেন বহুনা বলে ।’ এই বথা শুনিয়া মামুদ ছফি বলিলেন ‘অমব বাহা বলিব ও হা অমি গুকেবই বলিয়াছি । ধর্ম্মাধমেব বহুনা আশেবাজ্জসা বহুনা লাভ কবি’ সেই দিন বাত্রি অশ্রু ন এ প্রহর থাকিতে মস্তক মাণিয়া বহুনা গিকাকে মাণিবাব জগ্না হাজা দেহা হইল তখন নুতন জগ্না বহুনা গিকাকে চাবিজন হস্তে ন সঙ্গে দিয়া পাইলেন এবং বলিলেন, ‘ভই গিয়া বহুনা গিকাকে বহুনা পাইব ।’ তৎপরে বহুনা গিয়া তে ক আনি সমস্থানে সঙ্গে কবিয়া চন্দ্রানি বহুনা তন কহিলি বলিল, ‘অমি মহাবাজেব তুন হইছি, মহাবাজ অশেষ কবিলেন অমি তহই কবিব ।’ কৌত্তি সিহ চন্দ্রানি হস্তে ন সঙ্গে লইয়া বহুনা গিয়া গে জগ্না যতিলেন সেখানে গেল । সেই সময়ে বহুনা গিয়া ঘন হইতে ছিলেন । যে সব লোক বহুনা গিকাকে পাহারা দিতেছিল কৌত্তি সিহ তাহ দিগন্তে দিয়া বহুনা গিকাকে খবব দেওয়াইল । সেই প্রহরী গিয়া বহুনা গিকাকে জগাইয়া বলিল, “মহাবাজ উঠ, বাক্য নিক, হইতে লোক অসিয়াছে ।” বহুনা গিকা ঘুম হইতে জাগিয়া তাহা বগগকে বলিলেন, “তোমরা কি দেখিতেছ, এখন আমাব মৃত্যুবাণ উপস্থিত হইয়াছে ।” তখন বহুনা গিকোব পত্নীগণ ফোঁপাইয়া কাদিতে লাগিলেন । তখন বহুনা গিকা তাহা পত্নীগণকে বলিলেন, “তোমরা কেন ব্যাকুল হও ? এখন প্রস্তুত হইয়া পলোকেব উপায় চিন্তা কবা উচিত ।’

কৌত্তি সিহ হাজাবি বহুনা গিকোব নিকটে গিয়া বলিল, “মহাবাজ,

তুমি প্রস্তুত হও। তোমাকে বধ করিবার জগা রাজা আমাদের পাঠাইয়া দিয়াছেন।” তখন রত্নমাণিকা বলিলেন, “আমাকে সরাইয়া দিয়া ভাই ঘনশ্যাম রাজা হইল; এখন আমাকে এক সের চাউল দিলে তাহা খাইয়া ধর্মচর্চা করিয়া ইষ্টদেবতার সেবা করিয়া দিনপাত করিতে পারি। বিনা অপরাধে আমাকে মারিষা রাজবন্দের পাপ করিলে তাহার কি লাভ হইবে? তাহাছাড়া তুই একজন রাজপুত্র। তুই হিন্দুধর্ম সম্পর্কে জানিস। তোবা যদি অগ্নায় ভাবে আমাকে বধ করিস তবে ধর্ম তোদের নষ্ট করবেন।” এই কথায় কীর্তি সিংহর মনে ধর্মভয় জাগরক হইল। সে রত্নমাণিকাকে না মারিয়া ফিবিয়া গিয়া মহেন্দ্র মাণিকাকে বলিল, “মহারাজ, আমি রত্নমাণিকাকে বধ করিতে পারিব না। যদি আমাকে চাকরিতে রাখিতে ভাল মনে করেন তবে রাখুন নতুবা বিদায় দিন, তবু আমি রত্নমাণিকাকে বধ করিতে পারিব না।”

তখন মহেন্দ্র মাণিকা কীর্তি সিংহরাজকে তাহার বাস ঘর পাঠাইয়া দিলেন এবং বিশ্বাসী ও অনেকদিন পূর্ব হইতে সঙ্গে সঙ্গে ছিল একপ চাকর-জন লোক রত্নমাণিকাকে মারিবার জগা পাঠাইয়া দিলেন। সেই লোকেরা গিয়া রত্নমাণিকাকে বলিল, “মহারাজ, তোমাকে বধ করিবার জগা রাজা আমাদের পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমি প্রস্তুত হও!” তখন রত্নমাণিকা বলিলেন, “কীর্তি সিংহ এই কাজ অগ্নায় মনে করিয়া আমাকে বধ না করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তবু তোমরা যখন আমাকে বধ করিতে আসিয়াছ, বেশ, আমি প্রস্তুত হই।” এই কথা বলিয়া রত্নমাণিকা স্নান করিয়া কাপড় পরিলেন এবং নিজের পত্নীগণকে বলিলেন, “তোমরা আশ্বস্ত হইও না। পরলোকের উপায় চিন্তা করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাক।” তারপর সেই চারিজন লোক রত্নমাণিকাকে ধরিয়া চাপিয়া মারিয়া ফেলিল।

একত্রিংশ অধ্যায়

রত্নমাণিক্যের মৃতদেহ সংকার

রত্নমাণিক্যের পত্নীগণ তাঁহার মৃতদেহ সম্মুখে রাখিয়া ঈশ্বরের নাম-গান করিতে লাগিলেন। রত্নমাণিক্যকে বধ করিয়া সেই চারজন লোক গিয়া এই খবর মহেন্দ্র মাণিক্যকে জনাইল। রাত্রি প্রভাত হইলে রাজা যুবরাজ, চন্দ্রমাণি বড়ঠাকুর ও অচ্যাত্ত বড় বড় লোকদিগকে ডাকিয়া আনাইলেন এবং ব্রাহ্মণ ও আনাইলেন। রাজা তাঁহাদের সকলকে বলিলেন, “রত্নমাণিক্যের মৃত্যু হইয়াছে এখন তাঁহাকে দাফ করবাব ব্যবস্থা কর।” তাবপর গোমতী নদীতীরে মুক্তিঘাটে রত্নমাণিক্যের জগ্ন চিতা প্রস্তুত করাইয়া দিলেন।

রাজা রত্নমাণিক্যের মৃতদেহ আনিবার জগ্ন যুবরাজ, চন্দ্রমাণি বড়ঠাকুর, অচ্যাত্ত বড়লোক এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে পাঠাইলেন। তাহার গিয়া রত্নমাণিক্যের মৃতদেহ দেখিয়া অনেক কান্নাকাটি করিলেন। যুবরাজ রত্নমাণিক্যের মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিয়া অনেক কাঁদিলেন। চন্দ্রমাণি ঠাকুরও রত্নমাণিক্যের শবের পাখে পড়িয়া “আজ আমার পিতৃ বিয়োগ হইয়াছে” বলিয়া কাঁদিলেন। এইকপে যুবরাজ ও চন্দ্রমাণি ঠাকুর বিলাপ করিয়া কান্নাকাটি করিলেন।

তখন রত্নমাণিক্যের পত্নীগণ বলিলেন, “এখন তোমরা অস্থির হইলে লাভ কি? তোমাদের অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে এখন আমাদের সদগতি যাহাতে হয় তাহার উপায় চিন্তা কর।” তাবপর সকলে প্রস্তুত হইয়া রত্নমাণিক্যের শব খাটে তুলিয়া লইলেন। সেই খাটে রত্নমাণিক্যের মহিষী বসিয়া শবের উপরে চানর দোলাইতে লাগিলেন। মৃত রাজার

অত্যাগ পত্নীগণকে ভিন্ন ভিন্ন দোলায় উঠাইয়া শবের দুই দিকে লইয়া যাওয়া হইল। তাহারা দোলায় উঠিয়া ঈশ্বরের নাম গন করিতেছিলেন এবং আবুলি, সিকি, আনি, ছুআনি এবং গ্রানআনি বিলাইতেছিলেন এবং খৈ, ফুল ইত্যাদি হিটাইয়া দিতেছিলেন। শবের সম্মুখে ব্রাহ্মগণ শঙ্খ-দণ্টা বাজাইয়া যাইতেছিল। বাজকেরা ৮ ৮ ৮ ইতে বাজাইতে যাইতেছিল হাতী-ঘোড়া ও সঙ্গে গিয়াছিল। যুবরাজ প্রভৃতি তাম্বের লোকেরা খালি-পথে ঘুরের সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছিলেন। রত্নমাণিক্যকে বধকণ হইয়াছে শুনিয়া নগবেব সকল স্থা পুরুষেরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শবের সঙ্গে চিতাব জায়গায় যাইতেছিল। শবের সঙ্গে যবরাজ প্রভৃতি যে সমস্ত বড় বড় লোক গিয়াছিলেন তাহারাও একশত্বে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছিলেন। যাহারা ঘরে রছিল তাহারাও কাঁদিতেন। মহেন্দ্র মাণিকা রাজা ও বড়মাণিক্যের শব দাহ করিতে লইয়া যাওয়ার সময়ে ব্রহ্মন্দ করিয়া বাজবাতীর ভিতবে চলিয়া গেলেন সেই দিন উৎসব নগবে ব্রহ্মন্দের ঢেউ বহিয়া গেল।

রত্নমাণিক্যকে দাহ করিতে নেওয়া হইলে পবে ব্রহ্মমাণিক্যের নিমাতা চন্দ্রমণি ঠাকুরের মা কান্নাকাটি করিয়া ‘ইহজন্মের মত ব্রহ্মমাণিক্য পুত্রের মুখ দেখিয়া অ’সি’ বালিয়া চিতাব নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি রত্নমাণিক্যের শব জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, “অম’ব স্বামী ব্রহ্মমাণিকা রাজা অ’মাকে যেকপ প্রতিপালন করিয়াছিলেন তুমিও সেইরূপ আমাকে প্রতিপালন করিয়াছ : আম’ব পুত্র চন্দ্রমণি যেকপ আম’ব সেবা করিয়াছে তুমিও সেইরূপ করিয়াছ ” এই কথা বলিয়া বিলাপ করিয়া ব্রহ্মন্দ কবিত্তে লাগিলেন। রত্নমাণিক্যের পত্নীগণ একে একে তাহাদের শাশুড়ীকে প্রণাম করিলেন। শাশুড়ী ও বধুগণকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, “তোমরা ভাগ্যবতী, স্বামীর সঙ্গে যাও।” তাবপব যুবরাজ ও চন্দ্রমণি ঠাকুর তাহাদের মাকে প্রবোধ দিয়া বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন।

সেই সময়ে মহেন্দ্র মাণিকা রাজা এক হাজার টাকার কপার আখুলি, সিকি,

ছ'আনি, আনি ও আধআনি লোক দিয়া সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। রত্ন-মাণিক্যের শবটিকে স্নান করান হইল ; তাঁহার পত্নীগণও স্নান করিলেন। তাহারা রাজার দেওয়া ঐ অর্থ ও নিজেদের গায়ের অলঙ্কার ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করিলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা নিয়মিতরূপে ঐ শব দাহ করাইল। চন্দ্রমণি ঠাকুর ধড়া লইলেন। তারপর সংকার শেষ করিয়া যুবরাজ ও চন্দ্রমণি বড়ঠাকুর মৃতের অস্থি লইয়া ফ্রন্দন করিয়া বাড়িতে ফিরিলেন। অগ্ন্যাগ্নি মাস্তাগণ্য লোকেরা ও নগরের সকল লোকজন ফ্রন্দন করিয়া নিজ নিজ বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন। পরে রাজা রত্নমাণিক্যের চিতার উপরে ইটের মঠ তৈরী করাইয়া দিলেন। পূর্বের রাজাদিগকে ও ঐ মুক্তিঘাটে দাহ করা হইত এবং তাঁহাদের চিতার উপরে ইটের তৈরী মঠ দেওয়া আছে। দশদিন গত হইলে চন্দ্রমণি ঠাকুর রত্নমাণিক্যের পিণ্ড দিলেন।

একমাস গত হইলে রাজা রত্নমাণিক্যের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করাইলেন ; দান-দক্ষিণা ও বিস্তব করিলেন। পরে রাজবংশীয় হরিধন ঠাকুরের পুত্রকে পাঠাইয়া এক হাজার টাকা ব্যয় করিয়া রত্নমাণিক্যের অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন করাইলেন। এক বৎসর অতীত হইলে এক হাজার টাকা ব্যয় করিয়া গয়া তীর্থে রত্নমাণিক্যের পিণ্ড দেওয়াইলেন। পরে মহেন্দ্র মাণিক্য রত্নমাণিক্যকে বধ করার জন্ত ডঙ্কর তীর্থে স্নান করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে অনেক করিয়া দান-দক্ষিণা করিলেন ; এবং জগন্নাথ দেবের উদ্দেশ্যে এক হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ভোগ দেওয়াইলেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

মামুদ ছফির বিদায়

এদিকে মহেন্দ্র মালিকা রাজা ঐ পোড়া ঘরগুলি হইতে সোনা-রুপা ও অন্যান্য জিনিস যাহা সম্ভব লইলেন। তালাস কবিয়া রাজা পঁচিশ লক্ষ টাকার সোনা ও রুপা উভয়ে মিলিয়া পাইলেন। রাজা মামুদ ছফিকে দিলেন দশ হাজার টাকা ও দুইটি হাতী। মামুদ ছফির ছেলেকে দিলেন এক হাজার টাকা ও একটি হাতী এবং মীর মুরাদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিলেন। ঐ টাকা ও জিনিস দিয়া মামুদ ছফিকে বিদায় দিলেন। যুবরাজ ও মামুদ ছফিকে দশ হাজার টাকা দিলেন। তারপর রাজা বাংলা দেশ হইতে নূতন নিযুক্ত লোকদিগের মধ্যে কিছু সংখ্যক চাকরিতে রাখিয়া অবশিষ্টদের বেতনের টাকা দিয়া বিদায় দিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রংপুরে রাজসভায় মহেন্দ্র মাণিক্যের দূত

তারপর শ্রাবণ মাসের দশদিন গত হইলে পূর্বের নিয়মে আমাদিগকে ত্রিপুরার বাজদরবারে সংবর্দ্ধনা করা হইল। পূর্বের নিয়মে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ফুলচন্দন দিয়া আমাদিগকে আমাদের বাসায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পূর্বের নিয়মে আমাদের খাণ্ডাদাওয়ার জিনিসপত্রও দেওয়া হইল। পরে মাঘ মাসের সাতদিন গত হইলে পূর্বের মত দরবার করিয়া আমাদিগকে বিদায় দেওয়া হইল। আমাদের প্রত্যেককে দিলেন আতলকের জামা, সোমালী কাজ কবা জিবা এবং কপাব ঝালব দেওয়া পটিকা। আমাদের ছইজনকে ও আমাদের পাইকদিগকে একত্রে দিলেন একশত টাকা।

রাজা ত্রিপুরার দূত অরিভীম নারায়ণকে পত্র ও উপঢৌকন দিয়া আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। অরিভীম নারায়ণের সঙ্গে আমরা ১৬৩৫ শকাব্দের ভাদ্র মাসের তেরদিন গত হইলে রংপুরে পৌছিলাম। স্বর্গদেবের আদেশে বড়বড়ুরা দিখৌ নদীর অপর পাড়ে জ্ঞানখানায় একটি বাসা করাইয়া দিলেন এবং সেই বাসায় অরিভীম নারায়ণ থাকিতে লাগিলেন। তাহার খাণ্ডাদাওয়ার আয়োজন পূর্বের নিয়মে দেওয়া হইল।

পরে কার্তিক মাসের বারদিন গত হইলে সপ্তমী তিথিতে শেষ বেলায় পূর্বের নিয়মে বড়বড়ুরা নিজ দরবারে সংবর্দ্ধনা করার জন্ত অরিভীমকে আনাইলেন। ত্রিপুরার সেই দূত-ও পূর্বের দূতগণের স্তায় বড়বড়ুরার ঘরে বসিলেন। তখন বড়বড়ুয়া প্রশ্ন করিলেন, “অরিভীম নারায়ণ, তুমি যখন

রওনা হও তখন তোমার রাজা মহেন্দ্র মাণিক্য কুশলে ছিলেন ত ? অরিভীম বলিলেন, “স্বর্গদেব, আমি যখন রওনা হই তখন আমাদের রাজা কুশলে ছিলেন।” বড়বড়ুয়া বলিলেন “তোমাদের রাজা কুশলে থাকুন আমারও ইহাই ইচ্ছা।” ত্রিপুরার দূত তখন পত্র দিলেন, মজুমদার সেই পত্র লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

ঐ পত্রে লেখা ছিল :—

স্বস্তি বিবিধ-গুণচয়-সমুদ্যোতিত-কলেবর-নানাদান প্রমোদীকৃত মার্গাগগন-প্রতাপ-তপন-বিগলিত-রিপু-নিকরাক্ষকার-শ্রীযুত-সুরত-সিংহ বড়ুয়া-বিমল-শীলেশু। প্রেমসম্পাদকো লেখঃ। বৃত্তান্ত এষঃ। শ্রীবত্সকন্দলী শ্রীঅর্জুন বৈরাগি-প্রমুখাং ভদ্রীয়াং সর্ব্বাং বৃত্তিং বিজ্ঞায় পবমানন্দযুতোহহম্। শ্রীযুতোরিভীম নারায়ণ-প্রণিধিরপি সর্ব্বমাবেদযিষ্যতীতি। পত্রসন্দেশার্থ-মীষদবত্ প্রহীয়তে, তদগ্রাহম্। কিম্বহনা, বাচনিকং তাবেব কথযিষ্যতঃ। বেদরামতু-শীতাংশুগণিতে শকবৎসরে। মার্গ শুক্ল দ্বিতীয়াং পত্নী চৈষা প্রহীয়তে ॥

তারপর বড়বড়ুয়া বলিলেন, “অরিভীম নাবাণ, রাজা মহেন্দ্র মাণিক্যেব পত্রে যাহা লেখা আছে তাহা শোনা গেল। তিনি মুখে কি কথা বলিয়া দিয়াছেন ?” দূত বলিলেন, “স্বর্গদেব, পত্রে যাহা লেখা আছে, মুখেও তাহাই বলিয়া দিয়াছেন।” পরে পূর্ব্বের নিয়মে ঐ দূতকে ফুল চন্দন, ও পান-নুপানি দেওয়া হইল। তখন বড়বড়ুয়া বলিলেন, “অবিভীম নারায়ণ, এখন কাসায় গিয়া বিজ্ঞাম কর, যদি তোমার ভাগ্যে থাকে তবে স্বর্গমহারাজের সাক্ষাৎ পাইবা।” তারপর ত্রিপুরার দূতকে পূর্ব্বের মত বাসায় লইয়া আসা হইল। পরে বড়বড়ুয়া মাসিক ও রোজ হিসাবে দ্বিগুণ করিয়া ঐ দূতের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পৌষ মাসের চব্বিশদিন গত হইলে পূর্ব্বের মত সভা করিয়া মহারাজ ত্রিপুরার দূতকে দরবারে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্ত আনাইলেন। দরবার সম্মুখ হইতে রত্নকন্দলীকে আনাইয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “দূতের নাম কি ? দূতের বংশ কি ? সে যে

সজ্জার দূত সেইরাজার নাম কি?" রত্নকল্যাণী বলিলেন, "দুহিত্র হান অসিদ্ধি কি নাশ। জাতিতে ত্রিশূরা, যে রাজার দূত তিনি—রত্নমাণিক্যের বর্মিক ভাই। নাম হচ্ছে রাশিক।"

পরে ঐশ্বর্যকে নিয়া লুপ্তবস্ত্র নিয়মে বহুচলার বিশিষ্ট জীবনায় রম্য হইল। উপঢৌকনগুলি শরীর উপরে বাধা হইল। তখন বড়বড় রাজা পরিচয় দিয়া বলিলেন, “স্বর্গদেব, বড়মানিক্য লোকান্তরিত হওয়ার রাজ্য মহোৎসব মাণিক্য স্বর্গদেবের-সমিষ্ট কামনা করিয়া পত্র ও উপঢৌকন লগ্নে দিয়া আশীর্বাদ নারায়ণ মহারাজের নিকট পাঠাইয়াছেন। সেই সূত ও মহারাজের চরণে প্রণাম করিতেছে।” তখন অগ্নিভীষ্ম নারায়ণ প্রণাম করিলেন। রক্ত কমলী পত্র নিয়া মজুমদারের হাতে দিলেন। মজুমদার পত্রখানি পাঠ করিলেন। পরে বড়পাত্র গোঁসাই জিজ্ঞাসা করিলেন, “অগ্নিভীষ্ম নারায়ণ স্বর্গদেবকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি যখন আস তখন কুশের মাণিকা রাজ্য কুশলে ছিলেন ত ?” “দূত ঠিকর করিলো, “স্বর্গদেব, আমি যখন এখানে রওনা হই তখন তিনি কুশলে ছিলেন।” পরে বড়পাত্র বলিলেন, “অগ্নিভীষ্ম নারায়ণ স্বর্গদেবকে বহিতেছেন-হে মহোৎসব মাণিক্য নারায়ণ জাহ্নবী রাজ্য লইয়া কুশল থাকিবেন-ইহাই তিনি কামনা করেন।”

পক্ষে লেখা ছিল :-

[illegible]

ত্রিপুরা-বিধির-বিপ্লবে। জনক করি-তুরঙ্গমাতৃকে-বিধি-বিধিবোধিত-
 বিদ্রোহ-কৃত্যার্থী-কৃত্যার্থীস্বার্থ-গীরমান-বশঃপ্রকাশী-কৃত্যার্থীমন্ত্ৰেণ, ঐশ্বর্য-
 বর্গদেব-রুদ্রসিংহ মহারাজ-পরম-পবিত্র চরিত্রেণ। ঐশ্বর্য-মহেশ্ব-
 দৈবত সর্বমঙ্গল-উত্তীর্ণ-সম্পাদয়িত্রী পত্নী বিজ্ঞতে। ঐশ্বর্য-বদনদিনো-
 পটীমান-ভবীমব্যাক্ত-সতীশ্রুঃ সমরোচিত-নিজ ভাবুক-ভাবিতোহহম্।
 আশ্রয়ে ঐশ্বর্য-মহেশ্ব-কিং ন দত্তম্, তথাপি পত্নীসন্দেহাধীশ্রুৎ প্রেততে
 ঐশ্বর্য-বর্গ-প্রাণিধিবারা বদীমঙ্গল প্রকাশ্যে হৃদয়ভিনন্দকৈঃ ভবান্ধৈশ্বর্যমা-
 রমণাত্মী করিত্যমহে। আলমতিবিক্রমেণ গিরাম্। ঐশ্বর্য-রত্নকন্দলী
 ঐশ্বর্য-ভাবুক বৈরাগি-প্রমুখাৎ সর্বং বিজ্ঞাতব্যমিতি। বেদাঙ্গিরস-গুণা-
 গণিতে-লক্ষ্যমহে। মার্গ গুণ দ্বিতীয়ায় পত্নী চৈবা প্রহীযতে। হৃদি-
 স্তিরস্ত সজ্ঞায়া বিরাট-রূপদাবশি। দূরহৌ সময়ে তৌচ সৌহার্দ্যভিত-
 কারিণৌ। অপরক-কৈলাসেশ্বর-মুন্দ-কঙ্ক-করক-কর্ণ-হারশ্রিত।
 জ্যোৎস্নাধার-রাজহংস-মুন্দ-কীরোনীর-দ্যুতিঃ। কীর্ত্তি-রত্ন-রত্ন-রত্ন-
 বিদু-কৌশল-বিশী-বিশিষ্টা। মৃত্যুনাভুতে হুয়ে-নয়ন-কোমল-
 হিরণ্ময়। তরঙ্গ-রত্নপাত্ৰ বলিলেন, “অরিতীম নারায়ণ, স্বর্গ মহারাজ
 যে মহেশ্ব-মাশিক্য রাজা পড়ে বাহ্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন
 তাহা শোনা গেল, এখন মুখে কি বলিয়া দিয়াছেন তাহা বল।” তখন
 ত্রিপুরার নৃত্য উত্তর করিলেন, “স্বর্গদেব, পড়ে বাহ্য দেখা আছে মুখেও
 তাহা লিখিয়া দিয়াছেন।” রত্নপাত্ৰ বলিলেন, “অরিতীম নারায়ণ, স্বর্গ মহা-
 রাজা বলিতেছেন যে এখন হুসি বাসার পিতা বিজ্ঞান কর। মহেশ্ব-মাশিক্য
 পড়ে বাহ্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহাও উত্তর তোমার বাৎসর্য সময়ে দেওয়া
 হইবে।” পড়ে সেই নৃত্য-পূর্বের নিবন্ধক বাসার কীর্ত্তি আনিলেন।

১৬তম শতাব্দীর ঐতর্য-বাসের-একজন দিক-অতি-হইলে পর ত্রিপুরার
 নৃত্য-পূর্বের নিবন্ধে আবার দরবারে-আখিরা দিক-অতি-হইলে। একজন
 নৃত্য-পূর্বের বলিলেন, “অরিতীম নারায়ণ, স্বর্গ মহারাজ বলিতেছেন
 যে এখন হুসি বাসার পিতা বিজ্ঞান কর। মহেশ্ব-মাশিক্য পড়ে বাহ্য লিখিয়া
 পাঠাইয়াছেন তাহাও উত্তর তোমার বাৎসর্য সময়ে দেওয়া হইবে।”

স্বর্গ মহারাজের পত্রে দেওয়া আছে। স্বর্গ মহারাজ মহেন্দ্র মাণিক্য রাজাকে জানাইতে বলিতেছেন যে স্বর্গ মহারাজের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজার যে ঐক্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে তাহা সকল লোকে জানাজানি হইয়াছে। এই সম্পর্কের খবরতা যাহাতে না ঘটে মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা যেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখেন। মহেন্দ্র মাণিক্য যুধিষ্ঠিরাদি নৃপতি সকলের তুলনা দিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্যাদা রক্ষা করিষা কার্যকালে তিনি যেন স্বর্গ মহারাজের পক্ষে থাকেন।” পরে আবার বড়পাত্র গৌহাই বলিলেন, “অরিভীম নারাণ, তুমি আজ বাসায় গিয়া বিশ্রাম কর, অশ্রু দিন নিজ দেশে যাইও।” তারপর অরিভীম পূর্বের মত নিজ বাসায় ফিবিয়া আসিলেন।

চতুঃস্থ অধ্যায়ঃ

মহেন্দ্র মাণিক্যের নিকট দূতযোগে পত্র ও উপঢৌকন প্রেরণ

চৈত্র মাসের সাতাইশ দিন গত হইলে বড়বড়ুয়া ত্রিপুরার দূতকে বিদায় দিলেন। সেই সময়ে বড়বড়ুয়া বলিলেন, “অবিভীম নারায়ণ, তোমাকে স্বর্গদেব মহারাজা বিদায় দিয়াছেন, আজ আমিও বিদায় দিলাম। স্বর্গ মহারাজের সঙ্গে মহেন্দ্র মাণিক্যের যে প্রীতিকর সম্পর্কটি হইয়াছে তাহা যেন ক্ষুণ্ণ না হয় সে চেষ্টা করিও।” তারপব অবিভীমকে ফুলচন্দন দিয়া বলিলেন, “আজ বাসায় গিয়া বিশ্রাম কর, অগ্ৰদিন নিজ দেশে রওনা হইও।” ত্রিপুরার দূত পূর্বের মত বাসায় চলিয়া আসিলেন। স্বর্গদেবতা ত্রিপুরার দূতকে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি দিয়াছিলেন—সোনার লঠা কান-ফুল একজোড়া, চিকণ আতলকের জামা একটি, রূপালী পটকা একটি, রজিন পাগড়ি একটি, ফুল তোলা বড়কাপড় একটি, আতলকের ইজার একটি এবং টাকা ৬০। চারিজন দৈতাসিংহকে দিলেন—মজা জামা চারিটি, রজিন পাগড়ি চারিটি, এক ভাঁজের বড়কাপড় চারিটি, গন্ধীরা-খরীয়া পটকা চারিটি এবং ঢেঁকেরী চরার ইজার চারিটি। ইহাদের প্রত্যেককে ত্রিশ টাকা করিয়া দিলেন এবং একজন চাকরকে ছয় টাকা দিলেন।

স্বর্গ মহারাজা মহেন্দ্র মাণিক্যের নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন তাহাতে লেখা ছিল :—

অস্তি ত্রিপুরাশৌরীনাথ-চরণানুবিদ্য-সুন্দ-মকরন্দ-সন্দোহ-পাশাসমিত-
বস্তি-মুদ্রিত, বিবিধ-অমোঘাশিত-কীৰ্ত্তি-গুণাংক-ক্লিষ্ট-মোকর্ষী-বংশীকৃত্য-

শেষ-ধরা-মণ্ডল নিজতেজস্কোম-খর্বাকৃতারিত । প্রচয়োজ্ঞান-তুরঙ্গ-বারণ-চমুনিচয়-বিস্ফারিত-রুণগরিমাগ্রগণ্য-গণনীয়বর, নিখিল-শাস্ত্রজ্ঞা-শোভাপু-বাগজাল-পণ্ডিত-ব্যাপ্ত-গোষ্ঠ্যবচিত-মহেন্দ্রধাম, অশেষদানোদ্ধত-রব-হুবহুত-কর্ণাবদাত-যশঃপটলেষু, শ্রীশ্রীমহেন্দ্র মাণিক্য-মহারাজ-মহোদ্র-প্রতাপেষু । সম্রোদ-সম্পাদযিত্রী পত্নী বিরাজতে । সমিহ শ্রীমতাং প্রীতি-পাত্রীভূতানাং ভবাদৃশামনিশং কুশলমীহে । ভবতাং শ্রীযুতারিভীম নারায়ণ দ্বারা স্বীয়ানন্দ-প্রকাশাৎ ভবদ্বিজ্ঞাপ্তিমবগম্য সাহসাদিতঃ । প্রমোদাইর্ভবাদৃশৈঃ সৌহার্দ-যাহ্লাদজনকং মাদৃশাশ্রয়ঃ প্রোল্লসতি । হরগৌরী-পদাম্বুজ-মধুভ্রতয়ো-রাবধোঃ কিমলভ্যাং তথাপি কালানুসারতো মদমুঠেয়ে ভবিতব্যে ভবদ্বির্বি-ভাবনীয়ম্ । শ্রীযুত-রত্নকন্দলী শ্রীযুত অর্জুন দাস-মুখাদবশেষিতং বোদ্ধব্যম্ । কিম্বহনা, বাচাং পল্লবিতেন । বাণায়-স্বন্দবজ্জেন্দু-সম্মিতেশক-বৎসরে । নবম্যাং চৈত্রিকে কৃষ্ণে লিখিতা পত্রিকা শুভা । লক্ষ্যোজ্ঞনতঃ সূর্য্যো ভূর্মে তিষ্ঠতি পঙ্কজম্ । হযোঃ সৌহার্দসহকাং সময়ে হিতকারিনো ১৬৩৫ শক, মাস চৈত্র । উপঢৌনের জায় যথা :— নরা কাপড় একখানা, বুটদার রঘুনাথগী একখানা, কতিপা একটি, খর্গ ছই জোড়, জাঁতি ছইটি, পকরা কাট্টারি চারিখানা ।

বড়বড়ুয়া মহেন্দ্র মাণিক্যকে যে পত্র দিলেন তাহাতে লেখা ছিল :—
স্বস্তি শ্রীমৎ অহঁদেব-চরণ-সরোরহ-সেবনশর্জন-জনিত-নিজ-যশোরশি-হংসী-বিকাশিতাশামণ্ডল । সারাসার-বিচার-চাতুরী-বিরাজমান-রাজপদবী-সমাস্ত্রিতোদার-চরিত-মহারাজাধিরাজ-শ্রীশ্রীমহেন্দ্র মাণিক্যেষু । অরি-করি-সমর্দন-পঞ্চানন-প্রতিম-শ্রীযুত-সুরত সিংহ-বৃহদ্রুয়া-নামধেয়স্য সপ্রেম-বিজ্ঞাপন-পত্নী উদন্তুস্বেয়ম্ । শ্রীমদরিভীমনারায়ণ-বৈবধিক-বদনানুভব-বিষয়কমখিল-প্রবর্তন-মাকলয়াহমাপ্যায়িতঃ । পত্রসন্দেশার্থমনা-গর্ভঃ প্রস্ফাপ্যতে, তদা দাতব্যম্ । কিমধিকং বচসাং পল্লবিতেন স এব নিখিলং নিগদিষ্যতি । বাণ-বহুর্ভু-শুভ্রাংগ-গণিতে শক-হায়ণে । চৈত্রস্ত্র শ্রাম-পঞ্চম্যাং পত্রমেতৎ প্রহীয়তে । শ্রীরত্নকন্দলী শ্রীযুতঅর্জুন-দাস-বার্দ্ধাবহাবপি

সমস্তমাবেদয়িয়াত ইতি । উপঢৌকনের জাব যথা :— নরা কাপড় একখানা, গুল্ল চামর একটি । বড়বড়ুয়া ত্রিপুরার দূত অরিত্তীম নারায়কে যে পুরস্কার দিলেন তাহার জাব যথা :— সূতী জামা একটি, আঁচলে ফুল-তোলা বড়কাপড় একজোড়, সূতী পটুকা একটি, রত্নিন পাগড়ি একটি এবং আতলকের ইজার একটি ।

পরে স্বর্গদেব মহাবাজেব সঙ্গে সোনাবী নদীর পাড়ের অস্থায়ী আবাসস্থানে ত্রিপুরার দূত ও গেলেন । সেখানে স্বর্গ মহারাজ তর্কবাগীশকে জিজ্ঞাসা করিয়া অরিত্তীমকে দুইশত টাকা এবং সোনার তাবেরবালা একজোড় দিয়া ১৬৩৬ শকাব্দের বৈশাখ মাসেব দুই দিন গত হইলে আমাদের সঙ্গে তাহাকে ত্রিপুরার পাঠাইয়া দিলেন । আমবা ত্রিপুরায় পৌঁছিবার পূর্বেই মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা হইয়া এক বৎসর দুইমাস কাল রাজত্ব করার পর গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছিলেন । মহেন্দ্র মাণিক্যের পর দুর্জয় সিংহ যুবরাজ ত্রিপুরাব রাজা হইয়া ধর্ম মাণিক্য নাম গ্রহণ করিলেন । এদিকে ত্রিপুরার ঐ দূতের সঙ্গে আমরা পৌষ মাসের চব্বিশ দিন গত হইলে ত্রিপুরা বাজার নগবে পৌঁছিয়াম । ধর্মমাণিক্য রাজা পূর্বের নিয়মে আমাদেরিগেব থাকিবাব ও খাওয়ার ব্যবস্থা কবিয়া দিলেন ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

ধর্ম্ম মাণিক্য আমাদিগকে বিদায় দিলেন

১৬৩৭ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের দুইদিন গত হইলে ধর্ম্মমাণিক্য রাজা আমাদিগকে দরবারে সংবন্ধনা করিয়া এবং পূর্বের নিয়মে সম্ভাষণ করিয়া বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। পরে জ্যৈষ্ঠ মাসের কুড়িদিন গত হইলে আমাদিগকে বিদায় দিলেন। ধর্ম্মমাণিক্য রাজা আব কোনও দূত পাঠাইলেন না। আমাদেবু হাতে তাঁহার পত্র ও উপঢৌকন দিয়া দিলেন।

ঐ পত্রে লেখা ছিল :—

স্বস্তি শ্রীমন্তভবানী-পদ-পঙ্কজ ধূলিপটল-রঞ্জিত-মনোমন্ত-মধুভ্রতানবরত-বিস্রাবণ-দুরীকৃত-দুর্গত-দারিদ্ৰ, কর-কলিত-নিম্নিঃশাখা-জঙ্ঘরীকৃতশেষ-রিপুকুল, নয়বিনয়-নৈপুণ্য-বশীকৃতশেষ-দ্বিজ-সর্জন, কর্পূব-পাগুর-যশঃপুর-পরিপূরিত-সমস্তাশামগুল, বিবিধগুণ সম্পন্ন-জন-মণ্ডিত-নিজাবাসস্থল, সকল-শাস্ত্র-বিশারদ-বৃক্ষমণ্ডলী-পরিমণ্ডিত গোষ্ঠিকেষু। শ্রীশ্রীযুত-কদ্রসিংহ-মহারাজাধিরাজ-মহামহোদ্র প্রতাপেযু। প্রবৃতি-নিবেদয়িত্রী পত্নীমুজ্জ্বলভে, শ্রীমতাং প্রেমধানী-ভূতাণাং ভবিকমিহামহেতরাম্। ভবদৃশাং পত্নীমবগম্য শ্রীযুত-রত্নকন্দলী শ্রীযুত অর্জুনদাস-মুখাদ্ ভবদীয়-সন্তোষঞ্চ শ্রদ্ধা বয়মাপ্য-য়িতাঃ। শ্রীচূর্ণাচরণ-পঙ্কজ-ভঙ্গরোরাবয়োঃ কিমপি তুর্লভ্যস্তি। তথাপি সময়বশাৎদুঃস্থে ভবিতব্যে তৎপরিচুচিৎ বিধেয়ম্। অবশেষ-বুদ্ধান্তঃ শ্রীযুত রত্নকন্দলী শ্রীযুত অর্জুনদাস দ্বারা বোদ্ধব্যঃ। কিংবদনং বচসাঃ

পল্লবিতেন। তৎপ্রেম যৎ পরা-ভেদমনির্ব্বাচ্যমিয়ন্তয়া। অদূরনুরয়োত্ত্বল্যা বর্দ্ধমানমভঙ্গুরম্। সপ্ত-রামর্ষ-শীতাম্শু প্রমিতে শক বৎসরে। জৈষ্ঠস্য কৃষ্ণপঞ্চম্যাং লিখিতেয়ঞ্চ পত্রিকা। পত্রসন্দেশার্থং কিমপি প্রেষ্যতে, যথা-বিহিতং কার্য্যমিতি। উপঢৌকনের ফিরিস্তি যথাঃ—বাপ্তা দুই থান, আত-লঞ্চ এক থান, ছিট কাপড় দুই থান। এই সকল জিনিসগুলি ধর্ম্ম মাণিক্য স্বর্গদেব মহারাজের জন্তু দিয়াছিলেন।

ধর্ম্মমাণিক্য বড়বড়ুয়াকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহাতে লেখা ছিল—

ঈশ্বরি শ্রীমন্নন্দ-নন্দন-পাথোকহ-রেণু-পিশঙ্গিতাস্ত্রঃ-করণ-মধুভ্রত, নয়-বিনয়-সহিত্ত্যালৌল্য বশীকৃতশেষ-রাষ্ট্রমণ্ডল শ্রীযুত-স্বংথসিংহ বহদুরুয়া নামধেয় মহাশয় পবিত্র চরিত্রেব্। সৌহার্দ বিজ্ঞাপন পত্নীয়াং বিরাজতে। ভুবত্যা ভাবুক-বার্ভামবগম্য পত্নীয়াং প্রাপ্য চ বয়মাপ্যায়িতাঃ। অস্বদীয় বৃত্তা-স্তং শ্রীযুত রত্নকন্দলী শ্রীযুতাজ্জুনদাসৌ নিগদিস্ততঃ। কিং বহুনা বচসা পল্লবিতেন। অন্ধি-বহ্নি রসজ্জাভি-গুণিতে শক বৎসরে। জৈষ্ঠস্য কৃষ্ণপঞ্চ-ম্যাং লিখিতা পত্রিকা শুভা। পত্রসন্দেশার্থং কিমপি প্রেষ্যতে, তদা দাতব্য মিতি। ধর্ম্ম মাণিক্য বড়বড়ুয়ার জন্তু যে উপঢৌকন দিলেন তাহার জায় যথাঃ— অরংজেবী এক থান।

ত্রিপুরার রাজা ঐ পত্র ও উপঢৌকন আমাদের হাতে দিয়া বলিলেন, “তোমরা মহারাজের নিকট বলিও যে পূর্ব্ব কখনও তাঁহার সঙ্গে আমাদের কোনও প্রীতি বা অপ্রীতি কিছুই ছিল না। রত্ন মাণিক্য রাজার সঙ্গে প্রীতি সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর হইতে আমাদের মধ্যে উহা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের মধ্যে এই প্রীতি যাহাতে হ্রাস না হয় সেই দিকে তিনি যেন লক্ষ রাখেন। নূত আসাযাওয়া করিলে প্রীতি থাকিবে আর না আসাযাওয়া করিলে থাকিবে না একথা যেন না হয়। আমরা সর্ব্বদা স্বর্গদেব মহারাজের প্রীতিপথে আছি। তাঁহার বা আমাদের বিশেষ কোনও কার্য্য উপস্থিত হইলে উভয়ে জানাজানি হইয়া সেমতে কার্য্য করা হইবে।” এই কথা বলিয়া পূর্ব্বের নিয়মে আমাদেরকে টাঙ্গা ও কাপড় দিয়া বিদায় দিলেন।

আমরা ত্রিপুরা হইতে রওনা হইয়া আসিয়া ভাদ্র মাসে গড়গাঁও এ পৌছিলাম। পরে সেই পত্র ও উপঢৌকনাদি লইয়া স্বর্গদেব মহাবাজেব চরণে নিবেদন করিলাম।

‘ত্রিপুরা দেশের কথা’ পুথির নির্ঘণ্ট

পত্র	পত্র
আনন্দিবাম মেধি আসিলেন— ৩	ঐ দূতদিগকে তুর্গোৎসবের সময়ে মন্দিরে প্রণাম
আনন্দিবামের সঙ্গে আমাদের লোক গেল— ৪	করাইল— ২৭
ত্রিপুরা রাজা আমাদের দেশে দূত পাঠাইলেন— ৮	আমাদের সঙ্গে ত্রিপুরার দূতদিগকে উদয়পুরে পাঠাইয়া দিলেন— ৩০
কাছাডেব বাজা ত্রিপুরার দূতগণকে সংবর্ধনা করিলেন— ১০	ত্রিপুরায় ঘাওয়ার পথের এবং সেখানে যাহা আছে তাহার বিবরণ— ৩১
গজপুবে ঐ দূতেরা আসিয়া স্বর্গদেবের লাগ পাইলেন এবং বড়বড়ুয়া তাহাদিগকে সংবর্ধনা করিলেন— ১১	ত্রিপুরার দূতগণের সঙ্গে আমরা ত্রিপুরায় পৌঁছিলাম— ৩৫
স্বর্গদেব সেই দূতদিগকে সংবর্ধনা করিবার আয়োজন করিলেন— ১৩	ত্রিপুরা বাজার রাজ্যের ও রাজধানীর বিবরণ— ৩৬
পত্র ও উপঢৌকন দিয়া দূতগণকে বিদায় দিলেন— ১২	ত্রিপুরা রাজার মাণিক্য নাম কি প্রকারে হইল— ৪৫
	ত্রিপুরা রাজার পূর্বপুরুষদের কথা— ৫৩

পত্র	পত্র
চম্পক রাই এর সঙ্গে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া পরে তাঁহাকে বধ করিল— ৫৭	এবং আমরা বলিলাম— ৮৬ মোট খেলা ৮৯
রাজার দৈনিক আচরণ— ৬১	খনশ্রাম রাজা হইবার জন্ত মুরাদ বেগের নিকট লোক পাঠাইয়া বাংলা দেশ হইতে লোক নিযুক্ত করিয়া আনা- ইতে লাগিল— ৯৯
রাজার ভগ্নীকে রাজত্বলভ নারাণের নিকটে বিবাহ দিলেন এবং তাহাকে আরো- য়ান ও নিশান দিলেন— ৬৫	মামুদ ছফি ও খনশ্রাম শপথ গ্রহণ করিল— ১০১
মুরাদ বেগের ভগ্নীকে আনি- বার জন্ত রাজা গোপনে এক- জন সেবক পাঠাইলেন, তাহাকে কাটিরা ফেলিল— ৬৬	যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব রাজাকে বলিলেন, “খনশ্রাম বিদেশী লোক নিযুক্ত করিয়া নিজে রাজা হইতে চায়” ১০২
খনশ্রাম ঠাকুর রাজা হইবার জন্ত মুরাদ বেগের সঙ্গে রাজার বিরোধ সৃষ্টি করিলেন এবং এই সংবাদ রাজা জানিতে পারিলেন না— ৬৭	খনশ্রাম, মামুদ ছফি এবং মুরাদ বেগ মন্ত্রণা করিতে লাগিল— ১০৩
খনশ্রাম ঠাকুর হাতী ধরিতে গেল— ৭১	খনশ্রাম যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিবকে তাহার নিকট ডাকিয়া পাঠাইল— ১০৪
আমাদিগকে দরবারে সংবর্ধনা করিবার আয়োজন করিল— ৭৪	যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিব খনশ্রামের নিকট গেল— ১০৮
আমাদিগকে আমাদের দেশের পুরাতন কথা জিজ্ঞাসা করিল	কোতোয়াল মুছিবকে খন শ্রাম শুল্কাবদ্ধ করিল— ১০৯
	যুবরাজ দশ হাজার টাকা মামুদ ছফিকে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়া বাড়িতে

পত্র	পত্র
আসিয়া গোপনে রাজাকে জানাইল— ১১১	প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জিনিসাদি দিয়া মামুদছকিকে ঢাকায় পাঠাইয়া দিল— ১৩৩
ঘনশ্রাম রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে বলিয়া আসিল— ১১৪	রত্নমাণিক্যের প্রাঙ্ক করাইল :— পত্র ও উপঢৌকন সঙ্গে দিয়া অরিভীমকে দূতরূপে আমা- দিগের সঙ্গে দিয়া বিদায় দিল— ১৩৪
পীতাম্বর হাজারী রত্নমাণিক্য রাজার হাতে ধরিয়া সিংহাসন হইতে নামাইয়া আনিল— ১১৫	ত্রিপুরার দূতকে সঙ্গে লইয়া আমরা রংপুরে পৌঁছিয়া— ১৩৫
ঘনশ্রাম রাজা হইল— ১১৬	ত্রিপুরার দূতকে বড়বড়ুয়া সংবন্দন করিলেন— ১৩৫
কোতোয়াল মুছিবকে কাটিল এবং ঘনশ্রামের নামে মোহর গড়াইল— ১১৮	স্বর্গদেব ত্রিপুরার দূতকে সংবন্দন করিলেন— ১৩৬
গগকে সংবন্দনা করিতে যাওয়া হইল এবং সেহাদন হঠাৎ রাজার ঘরে আগুন লাগিল— ১২০	স্বর্গদেব ত্রিপুরার দূতকে বিদায় দিলেন— ১৩৯
গজানারায়ণী ধাই রত্ন মাণিক্যকে বধ করিবার জন্ত পরামর্শ দিল— ১২৩	বড়বড়ুয়া ত্রিপুরার দূতকে বিদায় দিলেন— ১৪০
রত্ন মাণিক্যকে বধ করিবার জন্ত মামুদ ছকির মৃত্যুমত জিজ্ঞাসা করিল— ১২৫	অরিভীমের সঙ্গে আমরা যখন ত্রিপুরার রাজধানীতে পৌঁছিয়া তখন মহেন্দ্র মাণিক্য মারা সিংহাছে এবং ধর্মমাণিক্য রাজা হইয়াছে— ১৪৩
রত্নমাণিক্যকে বধ করা হইল, ইহাতে দেশের লোকেরা ঝাঁকিল— ১৩০	

১২০

ত্রিপুরা দেশের কথা

পত্র

পত্র

ত্রিপুরার রাজা আমাদিগকে

আমরা গড়গাঁও এ

সংবর্ধনা করিয়া বিদায়

পৌছিলাম—

১৪৬

দিলেম—

১৪৪

সমাপ্ত

